হিতকথা।

শ্রীশশিভূষণ সেন প্রণীত

তৃতীয় সংস্করণ

CALCUTTA :
PUBLISHED BY THE CITY BOOK SOCIETY,
64 College Street.

Printed by J. N. Bose,
Wilkins Press, College Square, Calcutta.
1912.

মূল্য ।৹ আনা

নিবেদন।

ছাত্রসাধারণ দেশের আশা ভরসার স্থল। তাহাদের কল্যাণ কামনায় হিতকথা প্রকাশিত হইল। হিতকথায় বিশেষ নূতন কথা নাই। যাহা হিতকথা তাহাই সত্যকথা। আবার যাহা সত্য, তাহা সনাতন। অতএব হিতকথায় গ্রন্থকারের মৌলিক কথা নাই। পুরাণ কথাগুলি নূতন ভাবে বলা হইয়াছে মাত্র।

জগতের সাধু ও সুধী সমাজ, মানব সমাজের হিতোদ্দেশে যে সকল কল্যাণকথা বলিয়াছেন ও বলিতেছেন এ পুস্তিকায় তাহার ক্ষীণ প্রতিধ্বনি মাত্র শুনাইতে চেষ্টা করা হইয়াছে। সর্ব্বত্র যে তাহার সফলতা হইয়াছে এমন বিশ্বাস নাই। অধিকন্তু কোথাও কোথাও হয়ত বা সেই জনহিতৈষী মহাপুরুষগণের কথার প্রতিধ্বনি বিকৃত ও অস্পষ্ট হইয়া থাকিতে পারে। তবে, ভরসা এই যে, সকলে, গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য দেখিয়া তদীয় কার্য্যের অপূর্ণতা ও ত্রুটির বিচার করিবেন।

গ্রন্থ সূচনা সম্বন্ধে এখানে দুই একটী কথা বলা আবশ্যক। ১৮৮৮ সালে এপ্রিল মাসে গ্রন্থকার এডিনবরা ইউনিভারসিটীর প্রসিদ্ধ অধ্যাপক স্বর্গীয় ব্ল্যাকী সাহেবের সেল্‌ফ কালচার (Professor J. S. Blackie's Selfculture) অনুবাদ করিবার অনুমতি পান। এবং তৎকালেই বর্ত্তমান যুগের প্রসিদ্ধ দার্শনিক হারবার্ট স্পেন্সার সাহেবের "এডুকেশন" (Mr. Herbert Spencer's Education) নামক গ্রন্থের অনুবাদের প্রস্তাবনা হয় ও তাঁহাদের মধ্যে পত্রাদি লেখা হয়। এতদুভয় গ্রন্থ অনুবাদ কালে, দেখা যায়, যে উহাদের আমূল ও অবিকল

অনুবাদ বঙ্গীয় ছাত্র ও পাঠক সাধারণের পক্ষে সম্পূর্ণ উপযোগী হইবে না। বঙ্গীয় ছাত্রসমাজে শিক্ষার যে সকল অভাব ও ত্রুটি, উক্ত গ্রন্থদ্বয়ের অনুবাদে সে সকলের মোচন হয় না। অনেক স্থলে সে গুলির উল্লেখ পর্য্যন্ত করিবার সুযোগ হয় না। এই সকল বিবেচনা করিয়া গ্রন্থকারকে উক্ত গ্রন্থদ্বয়ের অনুবাদ কার্য্য হইতে বিরত হইতে বাধ্য এবং নূতন পদ্ধতিতে এই গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হইতে হয়।

বঙ্গীয় ছাত্রগণের শিক্ষার অনেক অভাব, আবশ্যক ও ত্রুটি আছে। সেইগুলির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ও তাহাদের উপযোগী করিয়া এই গ্রন্থ রচিত হইল। এখানি কোন গ্রন্থ বিশেষের অনুবাদ নহে। তবে পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, হিতকথায় নূতন কথা নাই। কেবল পুরাণ সত্য ও কল্যাণ কথা নূতন আকারে দেশীয় ছাত্রগণের উপযোগী করিয়া তাহাদেরই হিতোদ্দেশে হিতকথা নামে প্রচারিত হইল। ইতি—

আরা।
১১ই জ্যৈষ্ঠ ১৩০৩

গ্রন্থকারস্য।

সূচীপত্র।

পূর্ব্বাভাষ—১—৯

১। শারীরিক কল্যাণের কথা।

স্বাস্থ্যই সকলের মূল—প্রাতরুত্থান শৌচাদি—ব্যায়াম—স্নান ও অঙ্গরাগ—আহার পান—চা কাফি ইত্যাদি—মদ্য ও মাদক দ্রব্য—ভ্রমণ—নিদ্রা—বেশভূষা—ক্রীড়া কৌতুক—উপসংহার………১০—২৬

২। মানসিক কল্যাণের কথা।

শরীর ও মনের সম্বন্ধ—মনের ধর্ম্ম—প্রকৃতিপর্য্যবেক্ষণ—পুস্তক পাঠ প্রণালী—অভিনিবেশ—কল্পনা—চিত্তরঞ্জিনীবৃত্তি—স্মৃতি—সাহিত্য আলোচনা—বিজ্ঞানচর্চ্চা—বাগ্মিতা—গোষ্ঠীকথা ও কথোপকথন—বৃত্তিশিক্ষা—উপসংহার… ২৭—৮০

৩। আধ্যাত্মিক ও নৈতিক কল্যাণের কথা।

সভ্যতার বৃদ্ধিতে বসুধায় কুটুম্বিতার বৃদ্ধি—ধর্ম্ম ও নীতিতে কতকগুলি সর্ব্বজনপালনীয় বিষয় নিষ্ঠা—শ্রদ্ধা ও ভক্তি—সত্য—সত্যচিন্তা—সত্যকথা—সত্যকর্ম্ম—সাহস—নম্রতা—আত্মসংযম—উদ্যম—আশা ও বিশ্বাস—অধ্যবসায়—শিষ্টাচার… ৮১—১২০

৪। উপসংহার—১২১—১২৫

অনুবাদ বঙ্গীয় ছাত্র ও পাঠক সাধারণের পক্ষে সম্পূর্ণ উপযোগী হইবে না। বঙ্গীয় ছাত্রসমাজে শিক্ষার যে সকল অভাব ও ত্রুটি, উক্ত গ্রন্থদ্বয়ের অনুবাদে সে সকলের মোচন হয় না। অনেক স্থলে সে গুলির উল্লেখ পর্য্যন্ত করিবার সুযোগ হয় না। এই সকল বিবেচনা করিয়া গ্রন্থকারকে উক্ত গ্রন্থদ্বয়ের অনুবাদ কার্য্য হইতে বিরত হইতে বাধ্য এবং নূতন পদ্ধতিতে এই গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হইতে হয়।

বঙ্গীয় ছাত্রগণের শিক্ষার অনেক অভাব, আবশ্যক ও ত্রুটি আছে। সেইগুলির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ও তাহাদের উপযোগী করিয়া এই গ্রন্থ রচিত হইল। এখানি কোন গ্রন্থ বিশেষের অনুবাদ নহে। তবে পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, হিতকথায় নূতন কথা নাই। কেবল পুরাণ সত্য ও কল্যাণ কথা নূতন আকারে দেশীয় ছাত্রগণের উপযোগী করিয়া তাহাদেরই হিতোদ্দেশে হিতকথা নামে প্রচারিত হইল। ইতি—

আরা।
১১ই জ্যৈষ্ঠ ১৩০৩।

গ্রন্থকারস্য।

সূচীপত্র।

পূর্ব্বাভাষ—১—৯

১। শারীরিক কল্যাণের কথা।

স্বাস্থ্যই সকলের মূল—প্রাতরুত্থান শৌচাদি—ব্যায়াম—স্নান ও অঙ্গরাগ—আহার পান—চা কাফি ইত্যাদি—মদ্য ও মাদক দ্রব্য—ভ্রমণ—নিদ্রা—বেশভূষা—ক্রীড়া কৌতুক—উপসংহার·········১০—২৬

২। মানসিক কল্যাণের কথা।

শরীর ও মনের সম্বন্ধ—মনের ধর্ম্ম—প্রকৃতিপর্য্যবেক্ষণ—পুস্তক পাঠ প্রণালী—অভিনিবেশ—কল্পনা—চিত্তরঞ্জিনীবৃত্তি—স্মৃতি—সাহিত্য আলোচনা—বিজ্ঞানচর্চ্চা—বাগ্মিতা—গোষ্ঠীকথা ও কথোপকথন—বৃত্তিশিক্ষা—উপসংহার··· ২৭—৮০

৩। আধ্যাত্মিক ও নৈতিক কল্যাণের কথা।

সভ্যতার বৃদ্ধিতে বসুধায় কুটুম্বিতার বৃদ্ধি—ধর্ম্ম ও নীতিতে কতকগুলি সর্ব্বজনপালনীয় বিষয় নিষ্ঠা—শ্রদ্ধা ও ভক্তি—সত্য—সত্যচিন্তা—সত্যকথা—সত্যকর্ম্ম—সাহস—নম্রতা—আত্মসংযম—উদ্যম—আশা ও বিশ্বাস—অধ্যবসায়—শিষ্টাচার··· ৮১—১২০

৪। উপসংহার—১২১—১২৫

হিতকথা।

পূর্ব্বাভাষ।

পঠদ্দশাই জীবনের উদ্যোগপর্ব্ব। অতি সাবধানে, অতি যত্নে, অতি পবিত্রভাবে এ সময় অতিবাহিত করিতে হইবে। কঠোর সংসারসংগ্রামক্ষেত্রে যে যে বিষয় পাওয়া যায়, তাহার পূর্ব্বাভাষ এখানে দৃষ্টিগোচর হয়। পদে পদে বাধা পাইবে, প্রতিযোগিতা পাইবে, প্রতিবাদ পাইবে, সৎকর্ম্মের তীব্র সমালোচনা পাইবে, কিন্তু এ সকলকে অতিক্রম করিতে না পারিলে শ্রেয়ঃ কোথায়? এ সকলকে অতিক্রম করিতে হইলে, যুদ্ধে জয়ী হইতে হইলে, সংসারে সফলকাম হইতে হইলে, শরীরে স্বাস্থ্য ও শক্তি চাই, মনে বল ও বিদ্যা চাই, হৃদয়ে প্রেম, ভক্তি ও ঈশ্বরকৃপায় দৃঢ় বিশ্বাস চাই। বিদ্যামন্দিরে, পঠদ্দশায়, ছাত্রজীবনে সেই সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। এই বিদ্যামন্দিরের অপ্রশস্ত প্রাঙ্গণে, যাহাদের সহিত ক্রীড়ায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেছ, কালে সংসারসংগ্রামক্ষেত্রে, কর্ম্মক্ষেত্রে, প্রকৃত প্রস্তাবে, জীবিকা বা যশের জন্য তাহাদের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে হইবে। আজ বিদ্যালয়ের বাৎসরিক পরীক্ষায়, পুরস্কার-লাভের জন্য যে সহাধ্যায়ীর সহিত প্রতিযোগিতায় আনন্দ অনুভব করিতেছ, একদিন জীবনের উচ্চতর পুরস্কারলাভের জন্য হয়ত তাহার সমকক্ষতা করিতে হইবে। হয় ত তাহার অপেক্ষা শত গুণ বলশালী প্রতিযোগীর পার্শ্বে দাঁড়াইতে হইবে—তখন দাঁড়াইতে পারিবে কি না কে জানে—হয় ত বা কর্ম্মক্ষেত্রে কাপুরুষের ন্যায় পৃষ্ঠভঙ্গ দিতে হইবে।

দীর্ঘকাল স্থায়ী ও ঘনিষ্ঠ হয় না। এক গৃহে একত্র আহার, একত্র ক্রীড়া, একত্র শয়ন করিলে যে ঘনিষ্ঠতা, প্রীতি ও স্নেহ-বাৎসল্যের সঞ্চার হয়, তাহা দশটাচারিটা-ব্যাপী অধ্যয়ন-অধ্যাপনায় সম্ভব নহে। বোধ হয় যেন এই সকল কারণেই তেমন শিষ্যবাৎসল্য ও গুরুভক্তি আর দেখা যায় না। ভক্তি ও বাৎসল্যে শিক্ষা হৃদয়গ্রাহী ও সফল হয়। আদর্শ অনুকরণের চেষ্টাই ভক্তি ও ভালবাসার ধর্ম্ম। যেখানে গুরু শিষ্যের সম্বন্ধ ভক্তি বাৎসল্যে স্থাপিত সেখানে ছাত্র স্বতঃই গুরুর বিদ্যা, চরিত্র, ও সকল সদ্‌গুণ অনুকরণ করিতে চেষ্টা করিবে। তাহার ফলে ছাত্রের জীবন উন্নত হইবে, বিদ্যা সহজে অধিগত হইবে। এখন যেন সে ভাবটী তেমন দেখা যায় না। সেই জন্য এখানে গুরুভক্তির সম্বন্ধে দু-চারিটী কথা বলিতেছি। গুরুভক্তি বিনা বিদ্যালাভ হয় না, পুস্তকস্থ তত্ত্ব অধিগত হইলেও বিদ্যা সফল হয় না। সেই জন্যই বলা যায়, গুরু বিদ্যা দান করেন। বিদ্যা দেয়, বিক্রেয় নহে। আজকাল যদিও বিদ্যা বিক্রয় হইতেছে বটে, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, বিদ্যার জন্য যাহা দেওয়া হয় তাহা কি যথেষ্ট গুরু-দক্ষিণা? গুরুর ঋণ শোধ দেওয়া যায় না। সেই জন্য বলিতেছিলাম গুরু বিদ্যা দান করেন।

এখন জিজ্ঞাস্য, এই দানের পাত্র কে? আমরা দৈনিক জীবনে কি দেখি? লোকে আপনার সম্পত্তি কি ভাবে দেয়? কাহাকে দেয়? স্নেহ, প্রীতি ও দয়ার যে পাত্র, সেই দান পায়। যদি স্থাবর, অস্থাবর ধনসম্পত্তিতে এরূপ ব্যবস্থা হয়, তবে বল দেখি, দস্যু, তস্করে যে ধন লইতে পারে না, যে ধন দান করিলে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, সেই পরম ধন বিদ্যা সম্বন্ধে কি নিয়ম হওয়া স্বাভাবিক?

গুরুর নিকট বিদ্যাদান পাইবার জন্য ছাত্রের পাত্রতা আবশ্যক। আজকাল অন্যান্য পণ্যের ন্যায় অর্থ দিয়া পাত্রতা পাইতে লোকে

চেষ্টা করে। সেটী বড় ভুল। এই পাত্রতা পাইবার জন্য গুরুর প্রতি ছাত্রের অবিচলিত ভক্তি চাই। ভক্তির ঐন্দ্রজালিক শক্তি। ভক্ত, জ্ঞানপিপাসু ছাত্রের প্রতি স্বতঃই শিক্ষক প্রীত হয়েন এবং প্রীতির সহিত, বাৎসল্যের সহিত তাহাকে বিদ্যাদান করেন। যেখানে গুরুশিষ্যে এরূপ সম্বন্ধ, যেখানে শিক্ষা ভক্তিবাৎসল্যের উপর স্থাপিত, সেখানে সে সম্বন্ধ মধুর এবং শিক্ষা যে ফলবতী হইবে তাহা বলাই বাহুল্য।

মহাভারতের আয়োদধৌম্যের, উপমন্যু বা উদ্দালকের কথা বলিতেছি না, এই অর্থপ্রাধান্যের দিনে, কঠোর কলকারখানার দিনে, এই টীকা টিপ্পনী ব্যাখ্যাপুস্তকপণ্যের দিনে, তোমরা বিদ্যালয়ে লক্ষ্য করিয়া দেখিও ভক্তিমান্, শ্রদ্ধাবান্, জ্ঞানপিপাসু ছাত্রই শিক্ষকের সম্যক্ প্রীতিভাজন ও কৃতবিদ্য হয়। তোমরা গুরুগৃহে থাকিয়া টোলেই পড়, আর বোর্ডিংএ থাকিয়া স্কুল কলেজেই পড়, কিংবা নিত্য পাঁচ ছয় ঘণ্টা ক্লাসেই অতিবাহিত কর, গুরুভক্তি বিনা প্রকৃত বিদ্যালাভ হয় না এটী সত্য বলিয়া জানিও। বিদ্যামন্দিরে শিক্ষক সেনাপতি, ছাত্রগণ সৈন্য। সৈন্যগণ সেনাপতির কথা যেমন দ্বিরুক্তি না করিয়া শুনে, তোমরাও তেমনই তাহার উপদেশ মত কাজ করিবে। ইহাতে তোমাদের শ্রেয়ঃই হইবে।

বিদ্যালয়ে শিক্ষকের পরই সহাধ্যায়িগণের কথা আসে। সহাধ্যায়িগণের সহিত কিরূপ সম্বন্ধ হওয়া উচিত, তাহাদের সহিত কিরূপ ব্যবহার করা উচিত, কি অর্থে সহাধ্যায়ী সহযোগী, কি ভাবে সতীর্থ প্রতিযোগী, এ সব কথা বিশেষরূপে জানা আবশ্যক।

হিন্দুশাস্ত্রে সতীর্থসম্বন্ধের নৈকট্য দেখাইয়াছে। কোন প্রকার উত্তরাধিকারীর অবর্ত্তমানে সম্পত্তির কিয়দংশ সতীর্থ পাইবে, এরূপ ব্যবস্থা দেখা যায়।

প্রাচীনকালে কি ছিল তাহা বলিলাম, এক্ষণে বর্ত্তমানের কথা বলি। স্বগৃহে পিতামাতা ও পরিজনের মধ্যে আদরে আহ্লাদে জীবনের প্রথম কাল কাটিয়া যায়। ইহার পর বিদ্যালয়ে যাইবার বয়স হইলে পিতা মাতা সন্তানকে পাঠার্থ বিদ্যালয়ে পাঠান। নবাগত বালক স্বগৃহে ও বিদ্যালয়ে বিশেষ প্রভেদ দেখে। সে প্রথমেই দেখে সেখানে সবাই সমান। আদর আবদারের স্থান সেটী নয়। যে শিক্ষকের কথা শুনে, পড়া শুনা করে, সেই ভাল থাকে। যখন এইটী সে বুঝিতে পারে, তখন সে ঘরের কথা ও বাটীর অভিমান ত্যাগ করে। অন্য সকল সহপাঠীর সহিত সমান হইয়া মিশিতে যায় ও মিশে। ক্রমে সখ্য বাড়ে। তাহার পর, পরীক্ষার সময় বালক যখন দেখে, যে ভাল পড়া বলে, পরীক্ষার ফল যাহার ভাল হয়, সে পুরস্কার পায়, প্রশংসাভাজন হয়, তখন সখ্যের সহিত প্রতিযোগিতার ভাব আসে। প্রতিযোগিতায় বল সঞ্চার হয়। প্রতিযোগীর যত বল বুদ্ধি দেখে, গুণবান্ বালক তাহার প্রতি তত আকৃষ্ট হয়। এই খানে একটী বৃত্তির সুন্দর স্ফূর্ত্তি হয়। যে অন্যত্র প্রতিযোগী প্রতিদ্বন্দ্বীকে শত্রু জ্ঞান করে, বিদ্যালয়ে সে প্রতিযোগীকে প্রীতি ও দ্বন্দ্বের চক্ষে দেখিতে শিখে। প্রতিযোগীর গুণের সুখ্যাতি করিতে শিক্ষা করে। সহপাঠিগণের মধ্যে থাকিলে উচ্চাভিলাষ বর্দ্ধিত হইবার সুযোগ হয়। গৃহে অদৃষ্টপরসামর্থ হইয়া আপনার বিদ্যা বুদ্ধির একটা অযথা মূল্য নিরূপণ করে। বিদ্যালয়ে আসিলে, সহাপাঠিগণের সহিত মিলিত হইয়া পরীক্ষা দিলে, আপনার ওজন বুঝিতে পারে। আপনার বিদ্যা বুদ্ধির মূল্য কি দেখিতে পায়। এই জন্য বর্ত্তমান প্রতিযোগিতার যুগে, আধুনিক বিদ্যালয় ও বিদ্যার্থিসাধারণের সহিত শিক্ষা বড় উপযোগী।

সতীর্থের সহিত সুহৃদের সম্বন্ধ। গৃহে, সহোদরগণ একই পিতা-মাতার আদর যত্নে লালিত পালিত হয় এবং একত্র আহার বিহার

ক্রীড়া কৌতুকে দিন অতিবাহিত করে। এই সকল কারণে, সান্নিধ্য ও সাহায্য হেতু পরস্পরের মধ্যে স্নেহ মমতা ও ভালবাসা বৃদ্ধি পায়। বিদ্যালয়ে তদ্রূপ একই শিক্ষকের নিকট বিদ্যাভ্যাস হেতু, নিত্য দেখা শুনা, কথাবার্ত্তা, আলাপ-পরিচয়, ক্রীড়া ও আমোদ হেতু সহপাঠিগণের মধ্যে স্বতঃ একটী সৌহার্দ্দ্যের ভাব বর্দ্ধিত হয়। সহাধ্যায়িগণের মধ্যে এইরূপ সম্বন্ধই বাঞ্ছনীয়। অবস্থার পার্থক্য হেতু, বুদ্ধিমত্তার আধিক্য হেতু, শিক্ষক ও সহাধ্যায়িগণের প্রশংসাজনিত গর্ব্ব হেতু কাহারও প্রতি অবজ্ঞা করা উচিত নহে। অবজ্ঞার মধ্যে বন্ধুতা বৃদ্ধি পায় না। অঙ্কুরের পক্ষে আওতা যেমন অনিষ্টকর বন্ধুতার পক্ষে অবজ্ঞাও তদ্রূপ। অপর দিকে অপেক্ষাকৃত হীন অবস্থাপন্ন ছাত্রগণের পক্ষে পার্শ্ববর্ত্তী সহাধ্যায়ীর সৌভাগ্যের ঈর্ষা প্রকাশ করা, অথবা কোন সতীর্থের বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষের হিংসা করা কিংবা পাঠের অল্প উন্নতি দেখিয়া ভগ্নহৃদয় হওয়া সুবুদ্ধির পরিচায়ক নহে। প্রথমে বিদ্যালয়ে প্রবেশ কালে, যেমন সকলকে সমান দেখিয়াছিলে, পরেও সেই ভাব রক্ষা করিয়া চলিতে চেষ্টা করিবে। সতীর্থকে এজন্য সহযোগী জ্ঞান করিবে, এরূপস্থলে সাহায্য দান বা গ্রহণ করিয়া সঙ্গে যাইবে। ইহাতে সৌহার্দ্দ্য বৃদ্ধি পাইবে। সকলে যেখানে সমান ভাবে থাকা যায়, সেখানে কতকগুলি সাধারণ নিয়ম রক্ষা করিয়া চলিতে হয়। সকল বিদ্যালয়েই এরূপ কতকগুলি সাধারণ নিয়ম আছে। কিন্তু ছাত্রবর্গের আপনাদের মধ্যেও নিয়ম থাকা আবশ্যক। বিদ্যালয়ে এমন পোষাক পরিচ্ছদে আসা উচিত নহে, যাহার প্রতি অনেকের মন আকৃষ্ট হয়, মূল্যবান পোষাক অথবা মলিন চীরখণ্ড উভয়ই পরিহার করা আবশ্যক। আজকাল সভ্য সমাজের নিয়ম এই যে, প্রত্যক্ষ ভাবে নিজের স্বার্থহানিকর না হইলে পরের অসুবিধা ও অসুখ জন্মান উচিত নহে। সেই হেতু, বহুমূল্য চাকচিক্যশালী পরিচ্ছদ পরিধানে অন্যের

অনর্থক দৃষ্টি আকর্ষণ করা এবং মলিন দুর্গন্ধময় চীরখণ্ড পরিধান করিয়া বিদ্যালয়ে আসা উচিত নহে। পাঠকালে গল্প বা গোল করা ও অভিনিবেশ নষ্ট করা অনুচিত। সংক্ষেপতঃ সহপাঠীদের মধ্যে সুহৃদ্ ভাব থাকিবে। পরীক্ষার স্থলে প্রতিযোগী হইলেও পাঠের সময়, বিদ্যা অভ্যাসের কালে সহযোগী হইবে। এরূপ করিলে ভবিষ্যৎ জীবনে কর্ম্মক্ষেত্রে লোকের সহিত ব্যবহার কালীন কখনও অবস্থা অনুসারে সহযোগী, কখন বা কার্য্যান্তরে তাহারই প্রতিযোগী হইবে। প্রতি-দ্বন্দ্বিতায়, প্রতিযোগিতায় প্রীতির ভাব রক্ষা করা আবশ্যক। যোগ্য বিপক্ষকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করিতে পারা উন্নত চরিত্রের পরিচায়ক।

অতঃপর পাঠ্য পুস্তক সম্বন্ধে কিছু বলিতেছি। প্রাচীনকালে মুদ্রাযন্ত্র ছিল না। কাজেই পাঠ্যাপাঠ্য পুস্তকের এত প্রাচুর্য্য ছিল না। সদ্‌গ্রন্থ নির্ব্বাচন করা প্রকৃত পক্ষেই কঠিন ব্যাপার হইয়াছে। শারীরিক স্বাস্থ্যের জন্য পথ্যাপথ্য বিচার করা যেমন আবশ্যক, মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য পাঠ্যাপাঠ্য বিচার তদ্রূপ আবশ্যক। তাহার পর পথ্যের পরিপাক যেমন আবশ্যক, তেমনই পঠিত বিষয় হৃদয়ঙ্গম করিয়া চিন্তা করা আবশ্যক। লোকে বহুভোজী হইলেই যে পুষ্ট ও বলিষ্ঠ হইবে এমন নহে। সেইরূপ বহু-গ্রন্থ-পাঠক মাত্রেই যে বিদ্বান্, বিবেচক ও চিন্তাশীল হইবে তাহার কোন অর্থ নাই। ভুক্ত বস্তুর পরিপাক দ্বারা বলাধান হয়, পাঠ্য বিষয় পড়িয়া, বুঝিয়া চিন্তা করিলে তবে মনের উৎকর্ষ হয়, চিন্তা শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং মনের পুষ্টিসাধন হয়। অতএব বহু গ্রন্থ পাঠের পূর্ব্বে গ্রন্থ বিচার করিবে। গ্রন্থ বিচার করিবার অগ্রে শ্রেণীপাঠ্য পুস্তকগুলি সম্যক্‌রূপে পাঠ করিবে এবং বুঝিতে চেষ্টা করিবে।

পঠিত বিষয়ে নিজে নিজে চিন্তা করিবে। এইরূপে ক্রমে বুদ্ধি প্রখরা হইবে। চিন্তাশক্তি, বিচার শক্তি বৃদ্ধি পাইবে। তখন গ্রন্থ

নির্ব্বাচন অপেক্ষাকৃত সহজ হইবে। নির্ব্বাচিত গ্রন্থ অল্পসংখ্যক হইলেও তাহা পাঠে সম্যক্ উপকার হইবে।

পূর্ব্বাভাষের উপসংহার কালে ও গ্রন্থারম্ভের প্রাক্কালে দুই একটী কথা বলিব। কিরূপ ভাবে গ্রন্থ পাঠ করিলে ফললাভ হয় তাহা জানা আবশ্যক। কেবল কৌতুহল চরিতার্থের জন্য সংবাদ সংগ্রহ করা আর চিন্তা গবেষণাদ্বারা মনোবৃত্তির বিবর্দ্ধনের জন্য পুস্তক অধ্যয়ন করা, এ দুই বিভিন্ন। জ্ঞানলাভের জন্য একটী ঐকান্তিক ইচ্ছা থাকা চাই। ঐ প্রবলা ইচ্ছা দ্বারা সতত প্রণোদিত হইয়া সত্য অন্বেষণ করিতে হইবে। যে শ্রেণী-পাঠ্য পুস্তক ও নির্ব্বাচিত পুস্তক পড়িতেছ, তাহার দ্বারা জ্ঞান বৃদ্ধি করিতে হইবে, সত্য সংগ্রহ করিতে হইবে, সংগৃহীত সত্য শারীরিক, মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক কল্যাণের জন্য জীবনে, অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত। এই ইচ্ছার সহিত পড়িতে বসিবে। দেখিবে ক্ষুদ্র সদ্‌গ্রন্থেও কত হিতকথা সত্যকথা ও কল্যাণের কথা আছে। সে কথাগুলি অভিনিবিষ্ট চিত্তে শুনিবে—তদনুসারে কার্য্য করিবে তাহাতে তোমাদের অশেষ কল্যাণ হইবে।

শারীরিক কল্যাণের কথা।

ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষের মূল স্বাস্থ্য। স্বাস্থ্যই এ দেহ-মন্দিরের ভিত্তি। শরীর ও স্বাস্থ্যকে উপেক্ষা করিয়া কোন কার্য্য করিতে পারা যায় না; করিতে গেলে তাহার অবশ্যম্ভাবী কুফল পাইতেই হইবে এবং সাফল্য সুদূর-পরাহত হইবে। দেহ মন, ও আত্মা লইয়া মানব। যাঁহার দেহ, মন ও আত্মার পূর্ণ বিকাশ হইয়াছে তিনি আদর্শ মানব। পূর্ণ মানবত্ব প্রাপ্তি সকলেরই জীবনের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। সে জন্য সকলেরই শক্তির অনুযায়ী চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। এই সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিতে হইলে, শরীর রক্ষাই প্রথম কার্য্য। সকল ধর্ম্ম সাধনের অগ্রে শরীর রক্ষা করিতে হইবে; সেই শরীর ও স্বাভাবিক স্বাস্থ্য রক্ষা করিয়া যদ্দ্বারা শারীরিক পূর্ণ বিকাশ হয় তাহাই এই অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়। ইহজগতে দেহ, মন ও আত্মার সম্বন্ধ অবিচ্ছেদ্য। একের উৎকর্ষের বা অপকর্ষের উপর, অপরের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ নির্ভর করে। এই জন্য মন সুস্থ রাখিতে হইলে সুস্থ শরীর চাই। জ্ঞানলাভেচ্ছু ছাত্রের শরীর ও স্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখা, সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য।

ছাত্র জ্ঞানযোগী। যোগ, সাধনাসাপেক্ষ। সংযম ও নিষ্ঠা যোগের প্রধান অঙ্গ। সংযমী ও নিষ্ঠাবান্ হইলে শরীর সুস্থ হয় ও পরমায়ুর বৃদ্ধি হয়; জ্ঞানলাভ সুলভ ও সহজ হয়। জ্ঞানযোগীর যাহাতে জ্ঞানলাভ সুগম হয় তাহাই কর্ত্তব্য। এ যোগ শাস্ত্রের প্রথম সূত্র, শরীর ও স্বাস্থ্য রক্ষা। এক্ষণে এই সূত্রপ্রতিপাদক নিয়ম গুলি সংক্ষেপে বিবৃত করা যাইতেছে।

সকল দেশে জ্ঞানী ব্যক্তিগণ প্রাতরুত্থানের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া থাকেন। আমাদের দেশে ত একথা বিশেষ করিয়া বলা হইয়াছে। "ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে শয্যা ত্যাগ করিবে।" "গুরুদেবের শয্যা ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে শিষ্য শয্যাত্যাগ করিবে," এইরূপ নীতিবাক্য সর্ব্বত্র শুনিতে পাওয়া যায়। বৈদেশিকগণও প্রাতরুত্থান স্বাস্থ্য, ধন ও জ্ঞানলাভের সহায় বলিয়া বিবেচনা করেন।

প্রাতরুত্থান।

অধুনাতন অনেক ছাত্র এই উৎকৃষ্ট নীতি প্রতিপালন করে না। তাহারা যামিনীর তৃতীয় যাম পর্য্যন্ত জাগরণ করিয়া পরে দিবসের প্রথম প্রহর নিদ্রায় অতিবাহিত করে। এটী বড়ই গর্হিত কার্য্য। সকল ছাত্রেরই প্রাতুরুত্থান অভ্যাস করা উচিত। দিবসের প্রথম মুহূর্ত্তকে দৈনিক কার্য্যের শুভ মুহূর্ত্ত করিতে হইবে।

প্রত্যূষে শয্যা ত্যাগ করিয়া শৌচাদি কর্ম্ম সমাপন করিতে হইবে, হস্ত পদাদি ধৌত ও মুখ প্রক্ষালন করিয়া বাহ্য অভ্যন্তরে শুচিতা লাভ করা কর্ত্তব্য। ছাত্র যে জ্ঞানযোগী. একথা যেন সর্ব্বদা মনে থাকে। সেই জন্য শুচির কথা বলা হইল। শুচি ও নিষ্ঠা ত্যাগ করিলে যোগভ্রষ্ট হয়। অতঃপর পবিত্র দেহে ও পবিত্র মনে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইয়া আপন ইষ্ট দেবতা স্মরণ করিতে হইবে।

শৌচাদি।

জ্ঞানযোগী ছাত্র উপাস্য দেবতাকে স্মরণ করিয়া দিবসের কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে। প্রথমে প্রাতর্ভ্রমণ বা ব্যায়াম কিংবা কোনরূপে অঙ্গচালনা দ্বারা সামান্য শারীরিক শ্রম দ্বারা দৈহিক ও মানসিক জড়তা দূর করা কর্ত্তব্য। ইহার পর বিদ্যার্থী হৃষ্টমনে পাঠে রত হইবে। এই সময় কিঞ্চিৎ আহার করা আবশ্যক। অবস্থানুসারে যাহার যাহা জুটিয়া উঠে তাহাই ভাল।

কথা প্রসঙ্গে, ব্যায়ামের উল্লেখ করা হইয়াছে এস্থলে অপেক্ষাকৃত বিস্তারিত রূপে উহা বলা যাইতেছে। সত্তর, আশী

ব্যায়াম।

বৎসর পূর্ব্বেও এদেশে কি ইতর কি ভদ্র সকলেই কুস্তি করিত। প্রায় সকল গ্রামে আখড়া ছিল, এখনও বিহার ও উত্তর পশ্চিম প্রদেশে আখড়া দেখা যায় এবং মহরম প্রভৃতি পর্ব্বোপলক্ষে কুস্তি কসরতে, শারীরিক বলের পরীক্ষা হয়। দুঃখের বিষয় এই যে, ক্রমেই এসকল জাতীয় ব্যায়াম পদ্ধতির চিহ্ন লোপ পাইতেছে।

কে না জানে যে পূর্ব্বে বাঙ্গলা দেশে ভদ্র সন্তানেরাও, লাঠি, তরওয়াল চালাইতে জানিতেন। প্রতাপাদিত্য ও সীতারামের নাম কে না জানে? কিন্তু সে দিন আর নাই। যাহা হউক বিদ্যালয়ে আবার ব্যায়ামের চর্চ্চা অল্পবিস্তর হইতেছে, এটী সুলক্ষণ, সন্দেহ নাই। বিদ্যালয়ে যে ব্যায়াম শিক্ষা হয়, তাহা ইংরাজী পদ্ধতি অনুসারে। বিলাতে প্রায় সর্ব্বত্রই বোর্ডিং স্কুল প্রচলিত। এই সকল বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণেই ব্যায়ামোপযোগী যন্ত্রাদি থাকে। বালকেরা যথাসময়ে নিয়-মিত ব্যায়াম করিতে পারে। কিন্তু আমাদের দেশে স্বতন্ত্র ব্যবস্থা। এখানে ছাত্রেরা সাধারণতঃ নিজ গৃহে বাস করিয়া প্রতিদিন শিক্ষকের উপদেশ লাভ করিতে বিদ্যালয়ে গমন করে। বিদ্যালয়সংলগ্ন ছাত্রাবাস অনেক স্থানেই নাই। যেখানে আছে, সেখানেও অল্প সংখ্যক প্রবাসী ছাত্রেরা বাস করে; সুতরাং প্রতিদিন পাঠান্তে অসময়ে ব্যায়াম শিক্ষা দেওয়া হয়; সেই জন্য তাহাতে আশানুরূপ ফল হইতেছে না। প্রাতঃকালে শৌচাদি প্রাতঃকৃত্যের পর অথবা সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে ব্যায়ামের প্রশস্ত সময়। মুদ্গার চালনা, লাঠি চালনা, ডহন করা, অন্যান্য জাতীয় বা বৈদেশিক কুস্তি কসরৎ যদি প্রচলিত হয় এবং গ্রামে গ্রামে আখড়া থাকে, তবে বালক বৃদ্ধ সকলেই যথা সময়ে ব্যায়াম অভ্যাস করিতে পারে। এ সকলের অভাবে বালকেরা আপন

আপন গৃহপ্রাঙ্গণে বা কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে নিত্য প্রাতঃকালে বা সন্ধ্যায় মুদ্গর চালনা ডহন ইত্যাদি সহজসাধ্য ব্যায়াম করিতে পারে। কিন্তু এই ব্যায়াম নিয়ম মত করা চাই।

যেখানে বিদ্যালয়ে ব্যায়ামের বন্দোবস্ত আছে এবং বিদ্যালয়ের সন্নিকটে যাহারা বাস করে, তাহাদের পক্ষে স্কুলপ্রাঙ্গণে ব্যায়াম-শিক্ষকের নিকট ব্যায়াম শিক্ষা করা সর্ব্বতোভাবে সুবিধাজনক। ভুক্ত-দ্রব্যপরিপাক, দেহপুষ্টি ও শরীরকে সুস্থ রাখিবার জন্য কোন না কোন প্রকারের শারীরিক শ্রম আবশ্যক। ব্যায়ামে এই শ্রম হয়, অধিকন্তু রীতিমত শিক্ষা করিলে কার্য্যে তৎপরতা, হস্তপদ চালনায় ক্ষিপ্রতা, আত্ম-রক্ষা ও শত্রু আক্রমণে সমর্থ ও কুশলী হওয়া যায়। দেহযষ্টি দৃঢ় ও কর্ম্মঠ হওয়া একান্ত আবশ্যক। এ সংসার, সংগ্রামক্ষেত্র—এ বসুন্ধরা বীরভোগ্যা—কাপুরুষসেব্যা নহে। বিদ্যা শিক্ষা করিয়া মানসিক উন্নতি করা যেমন আবশ্যক, ব্যায়ামাদি শিখিয়া শারীরিক উন্নতি সাধন করাও তদ্রূপ বাঞ্ছনীয়। দৈহিক উন্নতির সহিত মানসিকশক্তি বৃদ্ধি পায়, উৎসাহ বৃদ্ধি হয়, কার্য্যকারিণী জীবনী শক্তি বৃদ্ধি পায়। কার্য্য আমাদের জীবনীশক্তির পরিমাপক। জীর্ণ শীর্ণ রুগ্ন দেহে কি কার্য্য সম্ভব? সর্ব্ব কার্য্যে পারগ হইতে হইলে, দেহ বলিষ্ঠ ও কষ্টসহিষ্ণু করিতে হইলে, নিয়মিত আহার ও তদ্দ্বারা পুষ্টিসাধনের জন্য ব্যায়ামাদিজনিত শারীরিক শ্রম করিতে হইবে। এই জন্য প্রথমেই বলা হইয়াছে যে শরীর ও স্বাস্থ্য রক্ষা সর্ব্বাগ্রে। ব্যায়াম তৎসাধনের শ্রেষ্ঠ উপায়।

স্নান ও অঙ্গরাগ।

দেহকে দেবমন্দির জ্ঞানে সর্ব্বথা পবিত্র রাখা কর্ত্তব্য। দৈহিক শুচি লাভের জন্য স্নান শ্রেষ্ঠ উপায়। এতদ্ভিন্ন স্বাস্থ্য-রক্ষার অনুরোধেও স্নান আবশ্যক। গ্রীষ্মপ্রধান প্রাচ্য দেশে স্নান একান্ত বিধেয়। সুশীতল নির্ম্মল জলে অবগাহন প্রীতিকর। প্রাচ্য জগতে স্নানের মর্য্যাদা কে না অবগত আছে?

স্নানে কলুষ নাশ হয়, স্নানে পুণ্য সঞ্চয় হয়, স্নানে স্বাস্থ্যরক্ষা হয়, স্নানে মানবের দেহ ও আত্মার অশেষ কল্যাণ হয়, এইরূপ নানা মত এবং বিশ্বাস আছে। আমাদের সকল শুভকর্ম্মের পূর্ব্বে স্নানের বিধি আছে। প্রাচ্য জগতে জলের পাবনী শক্তিতে বিশ্বাস আছে। এইরূপ নানা কারণে আমাদের দেশে স্নান এত সাধারণ। সেইজন্য হিন্দুসাধারণে "পুণ্যতোয়া জাহ্নবী" বলে। নিত্য স্নান ত আমাদের মধ্যে ব্যবস্থা আছে; ইহা ভিন্ন বিশেষ দিনে, বিশেষ স্থানে, কোন কোন স্রোতস্বিনীতে বা সাগরসঙ্গমে, স্নানের বিধি আছে। এই সকল দ্বারা কি প্রমাণ হইতেছে? আমাদের স্নান একান্ত কর্ত্তব্য। এক্ষণে ইহা দেহের কল্যাণের জন্যই হউক, আত্মার মঙ্গলের জন্যই হউক, অথবা নিত্য অর্জ্জিত পাপ ক্ষয়ের জন্যই হউক, তাহার বিচার করিবার তত আবশ্যক নাই। গৌণতঃ স্নানের ফল যাহাই হউক না কেন, মুখ্য ভাবে, আমরা সুস্থদেহে স্নান করিয়া শরীরের স্বাস্থ্য রক্ষা করি। স্নান দ্বারা লোমকূপ গুলি মুক্ত হয়, রক্ত সঞ্চলন ক্রিয়া সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়। স্নানকালীন সন্তরণে ব্যায়ামের উদ্দেশ্যও সাধিত হয়।

আমাদের স্নানের পূর্ব্বে তৈল মর্দ্দন প্রথা বিশেষ হিতকর। অনেক সুবিজ্ঞ চিকিৎসাব্যবসায়ীরা ইহার উপকারিতা একবাক্যে স্বীকার করেন। তৈল মাখিয়া স্নান করা আবশ্যক। তাহাতে চর্ম্ম মসৃণ থাকে শীঘ্র লোল হয় না, দেহ স্নিগ্ধ ও শীতল থাকে।

স্নানান্তে অঙ্গরাগ সম্বন্ধে পূর্ব্বের প্রথা আর বড় প্রচলিত নাই। স্নানান্তে চন্দনচর্চ্চিত দেহে পূজায় বসিবার প্রথা উঠিয়া যাইতেছে, ক্রমে তদানুষঙ্গিক অঙ্গরাগ, মাল্য চন্দনও চলিয়া যাইতেছে। মুসলমানদিগের সময়ে আতর গোলাপের খুব প্রচলন ছিল। বর্ত্তমান সময়ে লেভেণ্ডার, ইউডিকলোন প্রভৃতি প্রচলিত হইতেছে। এগুলি অপর সকলের পক্ষে ভাল হইলেও এতদ্দ্বারা ছাত্রদিগের অঙ্গরাগ সম্পাদন

করিবার কোন আবশ্যক দেখা যায় না। স্নানান্তে কেশ পরিষ্কার করিয়া, পরিচ্ছন্ন পরিচ্ছদে অঙ্গ আবৃত করিয়া রাখিলে, স্বাস্থ্য ও শোভা দুইয়েরই উদ্দেশ্য সাধিত হইবে।

অবস্থা ভেদে ব্যবস্থা হয় আহার। পূর্ব্বের ন্যায় গুরুগৃহে বাস এবং পূর্ব্বাহ্নে অধ্যয়ন ও পূজাদি সমাপনান্তে মধ্যাহ্ন-ভোজনের কাল এখন আব মধ্যাহ্নও নহে। এখন বেলা ১০টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত বিদ্যালয়ে থাকিতে হয়। বিদ্যালয়ে যাইবার পূর্ব্বে যে আহার হয় তাহাই প্রধান আহার। এই আহার সম্বন্ধে অনেক কথা বলা যায়। স্মার্ত্ত বা আয়ুর্ব্বেদজ্ঞের আহারবিচার এখানে অপ্রাসঙ্গিক। তবে দুইয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বর্ত্তমান অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য করিয়া এ সম্বন্ধে কিছু বলা যাইতে পারে। আহারের সময় ও খাদ্যের নির্ব্বাচন সম্বন্ধে আলোচনা করাও আবশ্যক।

আহার সম্বন্ধে সাধারণ নিয়ম এই,—যে বস্তু সরস, স্বাদু, স্নিগ্ধ, যে বস্তু আহার করিলে আয়ুঃ, উৎসাহ, শক্তি, আরোগ্য, সুখ ও প্রীতির বৃদ্ধি হয়, সেই বস্তু আমাদের আহার্য্য হওয়া উচিত। আহার্য্য নির্ব্বাচনের সময়ে খাদ্যদ্রব্যে ঐ সকল গুণ আছে কি না দেখিতে হইবে। সকলগুলির অভাবে অন্ততঃ কতকগুলি থাকা আবশ্যক। ভোজনের মাত্রা, ক্ষুধা ও পরিপাক শক্তির অনুযায়ী হইবে। লজ্জা বা সভ্যতার অনুরোধে স্বল্পাহার বড়ই অন্যায়। শরীরের সর্ব্বদা ক্ষয় হইতেছে। পুষ্টিকর খাদ্য দ্বারা সেই ক্ষতিপূরণ করিয়া শরীর রক্ষা করিতে হইবে। পুষ্টিকর খাদ্য ও তাহার যথাপরিমাণ ভোজন ও পরিপাকের উপর শারীরিক বিকাশ বহুল পরিমাণে নির্ভর করিতেছে। যাহাকে অসুরের মত পরিশ্রম করিতে হইবে, তাহার তদনুরূপ আহার করা উচিত। অল্প ভোজন দোষাবহ। একদিকে অল্প ভোজন যেমন দোষাবহ অপরদিকে অতি ভোজনও তেমনই নিন্দনীয়। পাকস্থলীকে অযথা ভারা-

ক্রান্ত করা ও তদ্দ্বারা নানা রোগ উৎপন্ন করা অতীব গর্হিত কর্ম্ম। অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় ভোজনেও মিতাচার ভাল। কদন্ন ভোজন এবং অজীর্ণে ভোজন রোগমূলক।

জলযোগ ইত্যাদি যেমন তেমন হইলেও চলিয়া যায়। কিন্তু দিবসের প্রধান আহার উপেক্ষার বিষয় নহে। বর্ত্তমান সময়ে যখন লোককে দশটা এগারটার মধ্যে বিদ্যালয় বা কর্ম্মস্থলে যাইতে হয়, তখন তাহাকে বাধ্য হইয়া সেই সময়ের পূর্ব্বে আহার করিতে হইবে। কিন্তু আহারের পর কিঞ্চিৎ বিশ্রাম নিতান্ত আবশ্যক। সামান্য পশু পক্ষীরাও আহারের পর বিশ্রাম করে। আর মানুষ ভোজন করিয়াই ছুটাছুটী করিবে ইহা কি ভাল? আহারের পর কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম আবশ্যক। অতএব আহারের জন্য সময় নির্দ্দিষ্ট করিতে হইবে। স্নানাহার ও বিশ্রামের জন্য যথেষ্ট সময় রাখা উচিত। অত্যুষ্ণ অন্নব্যঞ্জন কোন প্রকারে গলাধঃকরণ করিয়া শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা সকল সময়ে দ্রুতবেগে বিদ্যালয়ে বা কর্ম্মস্থানে গমন করা অতিশয় স্বাস্থ্যহানিকর। ইহাতে আয়ুঃক্ষয় হয়। প্রসন্ন মনে আহার করিতে বসিবে, এবং অন্নগ্রাস উত্তমরূপে চর্ব্বণ করিবে, ইহাতে রসাস্বাদনের এবং পরিপাকের বিশেষ সাহায্য হয়।

কোন একটী নিয়মের প্রবর্ত্তন কালে তাহার ফলাফল অনুমান দ্বারা কতক পরিমাণে সাধ্য জানা যায়। কিন্তু সত্য, প্রত্যক্ষ ফল কি, সময় তাহা বলিয়া দেয়। প্রাচীন পূর্ব্বাহ্ণ ও পরাহ্ণ কালীন অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার পরিবর্ত্তে বেলা ১০টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত বিদ্যালয়ে পাঠের নিয়ম প্রচলন হেতু দুই এক পুরুষ পরে শারীরিক ইষ্টানিষ্ট কি ঘটিবে, মহাত্মা বেণ্টিঙ্ক, মেকলে ও তাঁহাদের অন্যান্য সহযোগিগণ তখন তাহা দেখিতে পান নাই। তাঁহারা যেন শরীর বাদ দিয়া মানসিক উন্নতির দিকটা বেশী দেখিয়া ছিলেন। আজ যদি তাঁহারা জীবিত থাকিতেন

এবং কোন আধুনিক বিদ্যামন্দিরে প্রবেশ করিতেন, তবে আমাদের শীর্ণদেহ অম্ল অজীর্ণ শিরঃপীড়াদিরোগগ্রস্ত ক্ষীণদৃষ্টি যুবকগণকে দেখিয়া কি মনে করিতেন জানি না। বাস্তবিক আমাদের যুবকগণ কথায় ও কাজে মস্তকসর্ব্বস্ব হইয়াছে। তাহাদের শীর্ণ দেহ-যষ্টির উপর বৃহৎ মস্তক—দুর্ব্বলদেহে উৎকট মানসিক শ্রম। অল্পাহার, অনিয়মিত ও অসময়ে আহারপ্রযুক্ত ও বিশ্রামাদির অভাবে ক্রমে তাহাদের ঐ দশা ঘটিয়াছে। যাহা হউক, সুখের বিষয় যে, এখন লোকের এ বিষয়ে দৃষ্টি পড়িয়াছে এবং লোকে এখন এই প্রথার ইষ্টানিষ্ট বিচার করিতেছে। আশা করা যায়, বিদ্যালয়ের সহিত ছাত্রনিবাস-স্থাপনাদি ও অন্যান্য সদুপায় দ্বারা এই দোষটী ক্রমে দূর হইবে। কোন বিষয়ে সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন সময়-সাপেক্ষ। যখন সে হিতকর পরিবর্ত্তন হইবে, তখন সকলেই তাহার সুফল ভোগ করিবে। কিন্তু যখন এ বিষয়ের অপকারিতা বুঝিতে পারিতেছি, তখন নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নহে। কিন্তু যতদিন তাহা না আসিতেছে, ততদিন আপন গৃহে আহারের সময়-সম্বন্ধে কোন বন্দোবস্ত করা আবশ্যক। যদ্দ্বারা আহার ও বিশ্রাম যথেষ্ট হয় ও স্বাস্থ্যকর হয় এবং স্বাস্থ্যের অনুকূল হয়, এরূপ ভাবে গৃহের কার্য্যপ্রণালী শৃঙ্খলাবদ্ধ করিতে হইবে।

দেশের ও সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় আমাদের কঠোর কর্ম্মের সময় দশটা হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত। পূর্ব্বে এই গ্রীষ্মপ্রধান দেশে যে মধ্যাহ্ন কাল বিশ্রামের সময় ছিল, এখন তাহাই কঠোর কর্ম্মের সময় হইয়াছে। এই প্রতিকূল অবস্থায় প্রাগুক্তরূপে কোন অনুকূল ব্যবস্থা না করিলে আর নিস্তার নাই। এখনও সাবধান হইবার সময় আছে। পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা হইতে আশা করা যায় যে, প্রত্যেক ছাত্রই আহারের বিষয়ে তাচ্ছিল্য করার কি ফল, তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইয়াছে। ভরসা করা যায়,

এখন জানিয়া শুনিয়া ছাত্রেরা ইচ্ছাপূর্ব্বক আহারাদির নিয়ম ভঙ্গ করিবে না।

এই গুরুতর বিষয়টী একদিকে ছাত্রদের যেমন বুঝা উচিত, অপরদিকে এটী তাহাদের পিতামাতা ও অভিভাবকগণের তদপেক্ষা বেশী বুঝা উচিত। কারণ তাঁহারা যদি এ বিষয়ে উদাসীন থাকেন, মনোযোগ না দেন, কোন বন্দোবস্ত না করেন, তবে বালকদের বুঝাতে কিছু ফলোদয় হইবে না। বুঝিয়া-শুঝিয়া যদি পিতামাতা ও অভিভাবকগণ ক্ষমতা সত্ত্বেও ইহার প্রতিবিধান না করেন, তবে ইহা অপেক্ষা পরিতাপের বিষয় আর কি হইতে পারে?

রাত্রির ভোজন-সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। রাত্রিকালে লঘু আহার ব্যবস্থা। প্রাচীন এবং আধুনিক চিকিৎসক ও সুধিগণ সকলেই এ ব্যবস্থা হিতকর বলেন। ছাত্রের পক্ষে রাত্রিকালে লঘু আহারে পাঠের সুবিধা হয়। রাত্রিতে গুরুভোজনের পর জাগরণ করিয়া অধ্যয়ন ইত্যাদিতে অজীর্ণ দোষ জন্মে ও নিদ্রার ব্যাঘাত হয়। অতএব সকলদিক বিবেচনা করিয়া দেখিলে, রাত্রিকালে লঘু আহারই হিতকর বলিয়া বোধ হয়।

পান।

নির্ম্মল জলের মত উৎকৃষ্ট পানীয় আর নাই। কিন্তু অন্যান্য সদ্বস্তুর ন্যায় ইহাও তত সুলভ নয়। নানা কারণে জল দূষিত হয়। তাহার মধ্যে প্রথম ও প্রধান—সংক্রামক-পীড়াজনক জীবাণু; এই জীবাণু সকল অনুবীক্ষণযন্ত্র ব্যতিরেকে দেখা যায়-না। সেইজন্য আমরা সচরাচর যাহা নির্ম্মল বলিয়া বিবেচনা করি, প্রকৃতপক্ষে তাহা তত নির্ম্মল নহে। বরং স্থলবিশেষে তাহাই মারাত্মক পীড়াজনক হয়। এইরূপ দূষিত জল পান করিলে নানা প্রকার পীড়া জন্মিতে পারে। নানা প্রকার সংক্রামক পীড়ার বীজ জলের সহিত দেহাভ্যন্তরে যাইলে সমূহ অনিষ্ট হইতে পারে। এই

সকল কারণে আধুনিক বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা বলেন যে, জল সিদ্ধ করিয়া শীতল হইলে ফট্‌কিরি প্রভৃতি জলপরিষ্কারক দ্রব্যদ্বারা নির্ম্মল ও কর্পূরাদি দ্বারা সুবাসিত করিয়া পান করিলে বিপদের আশঙ্কা থাকে না। সংক্ষেপতঃ, জল অগ্ন্যুত্তাপে অত্যন্ত গরম করিয়া, পরে শীতল হইলে পান করিলেই চলে। জল সিদ্ধ করিবার সময়, উত্তাপপ্রভাবে জলের মধ্যস্থ জীবাণু সকল নষ্ট হইয়া যায়। পানীয় জল-সম্বন্ধে সবিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক।

চা,কাফি ইত্যাদি।

সভ্যতা-বিস্তারের সঙ্গে আমাদের মধ্যে নানা প্রকার পানীয় প্রচলিত হইতেছে। চা আজকাল তামাকের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়াছে, বলিলে অত্যুক্তি হয় না। চা, কাফি, প্রভৃতির গুণাগুণ এখানে বিচার করিবার আবশ্যকতা নাই, তবে আমাদের দেশী একজন সুবিজ্ঞ শ্রদ্ধেয় চিকিৎসক চা ইত্যাদি কতক পরিমাণে অনিকষ্টকর বিবেচনা করেন। সর্ব্বোপরি একটী কথা, ছাত্রগণের এ সকল পান করিবার আবশ্যকতা কি? এ সকল ত জীবনধারণের জন্য অপরিহার্য্য সামগ্রী নহে, এগুলি ত অপেক্ষাকৃত বিলাসের সামগ্রী; জ্ঞানযোগী ছাত্রগণের বিলাস-লালসা দমন করাই শ্রেয়ঃ। বিলাস ভোগ করিতে কাহার না ইচ্ছা হয়? এইরূপ ইচ্ছা মানবের প্রকৃতি, কিন্তু ইহার নিবৃত্তিতে মহাফল—বিশেষতঃ জ্ঞানযোগী ছাত্রদিগের পক্ষে সংযমশিক্ষা একান্ত আবশ্যক।

মদ্য ও মাদকদ্রব্য।

মদ্যাদি যে অপেয়—এসম্বন্ধে আমাদের দেশে কঠোর শাস্ত্রবিধি আছে, আর সহজ যুক্তিতেও তাহা বুঝা যায়। মদ্যের অপকারিতা, মদ্যপের দুর্গতি ও তাহার পারিবারিক অশান্তির কথা প্রায় সকলেই অবগত আছে। পঠদ্দশা হইতে মদ্যের প্রতি যেন ঘোরতর ঘৃণা থাকে এবং মদ্য যে, অপেয় ও পাপজনক, তাহাও যেন সর্ব্বদা মনে থাকে।

ভ্রমণ, সকলের পক্ষে হিতকর। প্রাতর্ভ্রমণ, সর্ব্বদেশে সকলেই একবাক্যে ভাল বলিয়া থাকেন। বিশুদ্ধ পান ও আহার স্বাস্থ্যের পক্ষে যেমন অপরিহার্য্য, বিশুদ্ধ বায়ু সেবনও তদপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে। প্রাতঃকালে ও অপরাহ্নে মুক্ত স্থানে বিশুদ্ধ বায়ু সেবন স্বাস্থ্যপ্রদ। প্রাতঃকালে ও সায়াহ্নে প্রশস্ত প্রান্তরে ভ্রমণ করিলে দেহ সুস্থ ও মন প্রফুল্ল থাকে। প্রকৃতির শোভা-সন্দর্শনে প্রাণ ও মন পুলকিত হয়। প্রভাতে সূর্য্যোদয়ের প্রাকালে নিদ্রালস জগত যখন দিবসের নব নব কার্য্যের জন্য প্রস্তুত হইতে থাকে, ঊষা যখন হাস্যমুখে জগৎকে প্রকৃতির মোহিনীমূর্ত্তি দেখাইবার জন্য আহ্বান করে, নীরব বনস্থলী যখন ঊষালোকের প্রথম রশ্মিদর্শন করিয়া মুখরা হয়, পক্ষিগণের কাকলীতে গীতিপূর্ণ হয়, তখন কোন্ কঠিনহৃদয়, করুণাময়ের কমনীয় কীর্ত্তি, ঊষার আলোকময়ী প্রকৃতিকে দেখিয়া অনবদ্য আনন্দ ও ভক্তিতে পূর্ণ না হয়? আবার সায়াহ্নে প্রশান্ত প্রান্তরে আরক্তিম সূর্য্যের মূর্ত্তি এবং দিবসশ্রম-ক্লান্ত জগৎকে সুষুপ্তির ক্রোড়ে বিশ্রাম করিবার জন্য প্রকৃতির সস্নেহ আহ্বান তেমনই মনোহর ভাবোদ্দীপক।

ভ্রমণ।

কবিতাকাননে সতত ভ্রাম্যমাণ, কাব্যরসগ্রাহী পাঠক পূতি-গন্ধময় পাঠাগার ত্যাগ করিয়া একবার এই সময় আসিয়া জীবন্ত দৃশ্যকাব্যের অভিনয় দেখুক। প্রকৃতির নিত্যসহচর, স্বাধীন বিহঙ্গ-কুলের কাকলী শুনিয়া কর্ণকুহর তৃপ্ত করুক—শিশিরসিক্তা সদ্যো-জাগরিতা ভক্তিমতী প্রকৃতির সাহচর্য্যে, সতত সঞ্চরমাণ সমীরণ সেবনে বাহ্যাভ্যন্তরে পবিত্রতালাভ করুক। শিক্ষার্থী ছাত্রগণ আসল ত্যাগ করিয়া নকল লইয়া সর্ব্বদা ব্যস্ত হয়। শিল্পী কবি তাঁহার কাব্যে প্রকৃতির আলোকচিত্র * তুলেন মাত্র—আমাদের

* ফটোগ্রাফ।

ছাত্রগণ, পরীক্ষার দায়ে সততই ব্যস্ত, সেইজন্য পুস্তকবর্ণিত প্রকৃতি-বর্ণনা বরং মুখস্থ করিবে, তথাপি একবার উঠিয়া প্রকৃতির শোভা স্বচক্ষে দেখিবে না। ধিক্ এ শিক্ষাকে! যদি আলোকচিত্র দেখিয়া যাহার চিত্র তাহাকে না চিনিতে পারে, তবে কিসের জন্য এত পরিশ্রম? জীবনে লোকচরিত্রে, কাননে প্রান্তরে, বৃক্ষে বল্লরীতে, সিন্ধুতে সৈকতে, নীরেন্দ্রপ্রতিম নীল আকাশে স্বয়ং স্বচক্ষে দুইটী মিলাইয়া লইতে হইবে, তবে না শিক্ষা সার্থক হইবে!

এইরূপে এক কর্ম্মকে অন্য কর্ম্মের সহায় করিতে হইবে। পদব্রজে এবংবিধ ভ্রমণের মুখ্য উদ্দেশ্য শারীরিক স্বাস্থ্যসাধন হইলেও, গৌণতঃ ইহার দ্বারা মানসিক উন্নতিও সাধিত হইবে।

বিদ্যালয়ের অবকাশ-উপলক্ষে বিদেশভ্রমণে যাওয়া, শরীর ও মনের, দুয়েরই পক্ষে হিতকর। বিদেশভ্রমণে স্থান-পরিবর্ত্তন হয় এবং স্বাস্থ্যকর স্থানের জল বায়ুতে যে যে মহৎ উপকার সাধিত হয়, তাহা সকলেই অবগত আছে। এইরূপ ভ্রমণে, প্রাচীন ও বর্ত্তমান সময়ের কীর্ত্তিকলাপ দেখিয়া নানা বিষয় শিক্ষা হয়, তার পর যেখানে যাওয়া যায়, সে নগর বা জনপদ কত বড়, কেমন, সেখানে কি কি দ্রষ্টব্য পদার্থ আছে, সে স্থানের কি প্রকারে উন্নতি হইয়াছে কিংবা কিসে তাহা হইতে পারে, সে সকল বিষয়েরও জ্ঞান হয়। প্রাণিবাটীকা, যাদুঘর, কৌতুকাগার প্রভৃতি দর্শনে প্রভূত উপকার হয়। বিদেশের লোকের আচার-ব্যবহারের বিশেষত্ব জানা উচিত এবং সেখানকার প্রসিদ্ধ লোকের সহিত আলাপ পরিচয় করা কর্ত্তব্য। ইহা শিক্ষার একটী প্রকৃষ্ট উপায়।

আজকাল রেলওয়ে, ষ্টীমার, টেলিগ্রাফ, পোষ্টআফিস প্রভৃতি হওয়াতে দূরত্ব বলিয়া কথাটা যেন লোপ পাইতেছে—পৃথিবীর এক প্রান্তের লোক অপর প্রান্তে যাইতেছে,—লোক লোককে আপনার

জ্ঞান করিতেছে—একটী যেমন সার্ব্বজনীন সৌহার্দ্দ্যের ভাব আসিতেছে—এরূপ স্থলে সমগ্র ভারতবর্ষ অথবা সমগ্র বঙ্গ, বিহার ও উৎকল-ভ্রমণের কথাত অপেক্ষাকৃত কত সহজ! সুবিধা ও সুযোগ হইলে তাহা ত্যাগ করা উচিত নহে এবং না থাকিলে সুবিধা ও সুযোগ করিয়া লওয়া উচিত।

নিদ্রা।

ইতিপূর্ব্বে প্রাতরুত্থানের উল্লেখ আছে। নিদ্রা বিষয়ে কি কি নিয়ম পালন করিলে প্রাতঃরুত্থান সহজ ও সম্ভবপর হয়, তাহা সংক্ষেপতঃ বলা আবশ্যক। চিকিৎসকগণ স্বাস্থ্য-অনুসারে ছয় হইতে আট ঘণ্টা নিদ্রার ব্যবস্থা দেন। একজন বিজ্ঞ বিচক্ষণ ডাক্তার বলেন, মধ্য রাত্রির পূর্ব্বে দুই ঘণ্টা নিদ্রা, শেষ রাত্রে চারি ঘণ্টা নিদ্রার সমান। ইংরাজী প্রবাদবাক্যে বলে, অধিক রাত্রি হইবার পূর্ব্বে শয়ন এবং প্রত্যুষে শয্যাত্যাগ করিলে, লোক সুস্থ, ধনী ও জ্ঞানী হয়। রাত্রিতে অপেক্ষাকৃত স্বল্পাহার উপকারী, ইহাতে সুনিদ্রাও হয় এবং ভয়ঙ্কর স্বপ্নাদিও হয় না। রাত্রিকালে আহারান্তে অল্পক্ষণ বসিয়া মনোহর গল্প, গোষ্ঠীকথা কহা, ও সৎপ্রসঙ্গের আলোচনা করা বড় ভাল। তৎপরে আবশ্যক হইলে মলমূত্র ত্যাগ করিয়া হস্ত-পদাদি ধৌত করিয়া, শয্যায় শয়ন করিতে হইবে এবং দিবসের কৃত-কর্ম্মগুলি পর্য্যালোচনা করিতে করিতে, তন্দ্রা আসিবার পূর্ব্বে কায়মনোবাক্যে শুদ্ধ হইয়া. ইষ্টদেবতা স্মরণ করিয়া নিদ্রা যাওয়াই প্রশস্ত নিয়ম। সুনিদ্রা স্বাস্থ্যের পক্ষে একান্ত আবশ্যক। জ্ঞানযোগী ছাত্রের জ্ঞানপিপাসায় মধ্যরাত্রি অনিদ্রায় অতিক্রম করা দোষাবহ; এরূপ শারীরিক নিগ্রহ করিয়া হঠযোগের প্রয়োজন কি? এবংবিধ সাধনায় সিদ্ধিলাভ ঘটে না—বিপত্তি ঘটে। অতএব নিদ্রার নিয়ম কদাপি ভঙ্গ করা উচিত নয়—করিলে স্বাস্থ্যভঙ্গ হইবে—প্রাতরুত্থান অসম্ভব হইবে। ঊষা হইতে প্রদোষকাল-ব্যাপী সময়, মিতব্যয়ীর

ধনের ন্যায় ব্যয় করিলে যথেষ্ট হয়। তৎপরে রাত্রির তিন চারি ঘণ্টা লাভের অঙ্কে গণনা করা যাইতে পারে। এমত স্থলে নিদ্রার নিয়ম ভঙ্গ করা কি সুবুদ্ধির পরিচয়?

সাধারণ লোকে বলে যে বাঙ্গালীর জাতীয় কোন পরিচ্ছদ নাই। এস্থল, এ বিষয়ের বিচারের উপযোগী নহে। তবে প্রাচীন পরিধেয়, উত্তরায় ও পাদুকার দিন প্রায় চলিয়া গিয়াছে। তৎপরবর্ত্তী সময়ের, পায়জামা, মিরজাই, পাগড়ীর প্রচলনও প্রায় নাই, অথবা হ্যাট, কোট, প্যান্ট্‌লেন, বুটও সর্ব্বত্র প্রচলিত হয় নাই। কিংবা পেন্ট্‌লেন, চোগা, চাপকান, সাম্‌লাও সর্ব্বত্র চলিতেছে না।

বেশ ভূষা।

এখন বাঙ্গালীর পোষাকের, সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, এবং কলি, এই চারি যুগ একত্র দেখা যায়। আজকাল নিত্য নূতন ধরণের স্রোতে লোকে স্থির থাকিতে পায় না। ছাত্রদের মধ্যে বেশভূষার অত্যধিক পারিপাট্য, তাহাদের পাঠের প্রতি অমনোযোগের পরিচায়ক।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, ছাত্রগণ বিলাসী হইবে না—সংযমী হইবে। শারীরিক স্বাস্থ্যের পক্ষে অশন যেমন আবশ্যক, বসনও তেমনই প্রয়োজনীয়। পূর্ব্বে প্রসঙ্গতঃ বিদ্যালয়ে ছাত্রদিগের পরিচ্ছদের কথা একবার বলা হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে ছাত্রমণ্ডলীর মধ্যে একটা অবাঞ্ছনীয় বেশভূষার পারিপাট্য দেখা যাইতেছে। এটা একটী অশুভ চিহ্ন। ইহার প্রতীকার আবশ্যক।

যখন আমাদের কোন জাতীয় পোষাক বিশেষভাবে নির্দ্দিষ্ট নাই, তখন সে বিষয়ে বড় কিছু বলা যায় না; তবে পোষাক-সম্বন্ধে সর্ব্বত্র একটা সাধারণ নিয়ম আছে। পোষাক পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন, সুরুচিসঙ্গত হইবে। এমন পোষাক পরিধান করা উচিত যাহাতে অপরের দৃষ্টি আকর্ষণ না করে। এই দৃষ্টি দুই রকমে আকর্ষণ করিতে পারে—

১ম, যদি মলিন দুর্গন্ধময় ছিন্ন বসন পরিধান করা যায়, ২য়, যদি মূল্যবান চাক্‌চিক্যশালী অথবা কৌতুহলোদ্দীপক কোন পোষাক ব্যবহার করা যায়। এতদুভয়ই বর্জ্জনীয়। এরূপ পরিচ্ছদ সর্ব্বত্র ভদ্রজনোচিতরুচিবিরুদ্ধ।

লজ্জা নিবারণ ও শীতাতপ হইতে শরীর রক্ষা করা পোষাকের প্রথম উদ্দেশ্য। কিন্তু ক্রমে, পরিচ্ছদে "ফ্যাসনের" পারিপাট্য আসিতেছে। চরিত্রে চাপল্য নিন্দনীয়। "ফ্যাসানের" অনুরোধে নিত্য নূতন পোষাক পরিবর্ত্তন, লঘুচিত্ততার পরিচায়ক। জ্ঞানযোগী ছাত্রের চিত্তের উৎকর্ষ ও দৃঢ়তা, সাধনার সামগ্রী ; অতএব যাহা কিছু এ সাধনার অন্তরায় হয়, তাহাই বর্জ্জনীয়।

ক্রীড়া কৌতুক।

কিছুদিন পূর্ব্বে লোকের ধারণা ছিল এবং এখনও অনেকের ধারণা আছে যে, যে বালক সর্ব্বদা পড়া শুনা করে সেই সুবোধ। আমাদের পাঠ্য পুস্তকে, সুশীল ও সুবোধ বালকের যে সংজ্ঞা দেখিতে পাওয়া যায়, তদনুসারে, যে বালক স্থির ও গম্ভীরভাবে পাঠে রত, তাহাকে সুশীল ও সুবোধ বলে—পিতামাতাও তাঁহাদের ছেলেদের এরূপ দেখিতে চান। এইজন্য বোধ হয় আমাদের দেশে অকালপক্ব বালকের সংখ্যা এত বেশী। তাহারা কিশোর-বয়সের পূর্ব্বে যেন জীবনরহস্য অবগত হইয়া জরা বিনা বার্দ্ধক্য প্রাপ্ত হয়। জীবনের মধুময় প্রাতঃকাল, বাল্যাবস্থা, তাহারা আর ভোগ করিতে পায় না। হায় কি পরিতাপ! আমাদের সমাজ হইতে ক্রীড়াকৌতুক উঠিয়া যাইতেছে ; গৃহে ও বাহিরে নির্দ্দোষ ক্রীড়া-কৌতুকের কেহ প্রশংসা করেন না, জীবনধারণের জন্য আবশ্যক বিবেচনা করেন না ; অধিকন্তু নিন্দাবাদ করেন।

পাঠের জন্য পিতামাতা, সন্তানকে পীড়াপীড়ি করেন, কিন্তু পাঠান্তে নির্দ্দোষ ক্রীড়া-কৌতুকের জন্য তাঁহারা পীড়াপীড়ি করেন কই ?

বালকেরা স্বভাবতঃ ক্রীড়া ও ক্রীড়নকপ্রিয়। যখন এদেশে শিক্ষার স্রোতঃ এত খর বহে নাই, সেই বর্ত্তমান শিক্ষানীতির প্রথম প্রচলনের দিনে, যখন বঙ্গদেশের বালকগণ হেড়ে ডুগ ডুগ, ডাণ্ডাগুলি প্রভৃতি খেলায় মত্ত থাকিত, সেই সময়ে তাহাদের পাঠের দিকে মতি ফিরাইবার জন্যই, যেন বোধ হয়, তৎকালীন পাঠ্যপুস্তকাদিতে সুশীল ও সুবোধ বালকের ঐরূপ সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করা হইয়াছিল—সে দিন গিয়াছে—এখন তিন বৎসরের শিশু তৃতীয়ভাগ পড়ে।

বালকের প্রোজ্জল চক্ষু, সুমধুর স্বর, প্রফুল্লমুখ আর তত দেখা যায় না। কিজন্য তাহাদের এ আনন্দ গেল, তাহা জানিনা। একটা অকাল গাম্ভীর্য্য, একটা বিষাদের রেখা, তাহাদের চক্ষুর অন্তরালে কজ্জলের রেখার মত দেখা যায়। বঙ্গগৃহে পূজাপর্ব্ব দিন দিন কমিতেছে—নিত্যোৎসবময় বঙ্গগৃহ নিরানন্দের স্থান হইতেছে—সেই সঙ্গে বঙ্গবালকগণ আনন্দ হারাইতেছে। আনন্দ শরীর ও মনের বিকাশের প্রধান সহায়—নির্দ্দোষ ক্রীড়া-কৌতুক সেই আনন্দজননের অন্যতম প্রকৃষ্ট উপায়।

এই সব দেখিয়া শুনিয়া বোধ হয়, এখন মধ্যপথ অবলম্বনের সময় আসিয়াছে। আমাদের পরম সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, রাজা এই দোষ লক্ষ্য করিয়াছেন এবং এই স্রোতের গতি অন্য দিকে ফিরাইতেছেন। ভারতের রাজধানী, বঙ্গের শীর্ষস্থান, বর্ত্তমান শিক্ষার লীলাভূমি—কলিকাতায় সম্প্রতি ছাত্রসাধারণের ক্রীড়াভূমি নির্ম্মিত হইয়াছে।* রাজা যখন ক্রীড়া-কৌতুকে উৎসাহ ও উপদেশ দিতেছেন, তখন অচিরে বঙ্গে, পাঠের সহিত ক্রীড়ার প্রশংসা শুনা যাইবে।

মানব-মন সতত গুরুতর বিষয় চিন্তা করিয়া গম্ভীর হইয়া থাকিতে পারে না—মধ্যে মধ্যে বিশ্রাম অর্থাৎ শরীর ও মনের উপকারের জন্য

* মার্কাস স্কোয়ার।

ক্রীড়াকৌতুক, হাস্যপরিহাস আবশ্যক। এখানে একথা বলা বাহুল্য যে, এ সকল ক্রীড়াকৌতুক নির্দ্দোষ হইবে; অন্যথা তাহা শরীর ও মনের উপকারী কেমন করিয়া হইবে? "ক্রিকেট" "ফুটবল্" প্রভৃতি বৈদেশিক ক্রীড়া আজকাল খুব প্রচলিত। সেগুলির চর্চ্চা হউক, কিন্তু আমাদের দেশীয় যে সকল ক্রীড়া-কৌতুক আছে, সে গুলি জানা ও অভ্যাস করা উচিত। কারণ, ক্রীড়াপ্রিয় বালকেরা যদি সেগুলিতে অনাস্থা করে, তবে সেগুলি লোপ পাইবে—"প্রাচীনের" স্মৃতি লোপ করা, "বর্ত্তমানের" অকৃতজ্ঞতার পরিচায়ক—কারণ "অতীত" হইতে "বর্ত্তমান" সম্ভূত,—"বর্ত্তমান" স্বয়ম্ভূ নহে। অতএব স্বদেশপ্রিয়তা হেতুই হউক, কিংবা প্রাচীন সমাজ ও প্রথার অনুরোধেই, হউক, আর সে সকল ক্রীড়াকৌতুকের গুণেই হউক, সেগুলিকে চর্চ্চাদ্বারা জীবিত রাখা আবশ্যক—ইহাতে স্বদেশবাৎসল্যবৃত্তি বৃদ্ধি পাইবে এবং ক্রীড়া-কৌতুকের বাসনা তৃপ্ত হইবে।

এক্ষণে পূর্ব্বের কথাগুলি সংক্ষেপে বলা যাউক;—শরীর ও বাহ্য জগৎ একই প্রকার উপাদানে নির্ম্মিত। এতদুভয়ই জড়পদার্থ। শরীর সর্ব্বদা জড়ের সংঘর্ষণে আসিতেছে, অতএব শরীর যদি কোমল এবং স্বল্পক্লেশক্লান্ত হয়, তবে কঠোর কর্ম্মক্ষেত্রে অবতরণের পূর্ব্বেই তাহা অবসন্ন হইবে। কর্ম্মক্ষেত্রে, এই অবসাদ যাহাতে না হয়, কর্ম্মে যাহাতে প্রবৃত্তি হয়, কর্ম্ম-সাধনার্থ যাহাতে শক্তি হয় এবং কর্ম্ম-সিদ্ধিতে যাহাতে মঙ্গল হয়, সেই উদ্দেশ্যে এতক্ষণ শরীর, স্বাস্থ্য ও সামর্থ্যের কথা বুঝাইতে চেষ্টা করা গিয়াছে। জ্ঞানযোগী ছাত্র নিয়মিত সময়ে শৌচ স্নানাদি দ্বারা দৈহিক শুচি লাভ করিবে, ইষ্টদেবতা-স্মরণান্তর, দৈনিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে এবং হিতকর, পথ্য, পানাহারে শারীরিক পুষ্টিসাধন করিবে। ব্যায়ামাদি দ্বারা শারীরিক দৃঢ়তা ও আত-তায়ীর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষায় সামর্থ্য লাভ করিবে। দৈনিক

কার্য্যান্তে, সুনিদ্রায় দেহ মন বিশ্রাম লাভ করিবে এবং এইরূপে নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া চলিলে, এতৎসমুদয়ের সমবেত ফলে ছাত্র আয়ু, জ্ঞান, যশ, ধন ও ধর্ম্ম সকলই পাইবার উপযুক্ত হইবে। এরূপে যোগ্য হইয়া, ধর্ম্মভীত ও ঈশ্বরের কৃপায় আশ্বস্ত হইয়া পুরুষকারে পূর্ণ-বিশ্বাস করিয়া ঈপ্সিত বস্তুলাভের জন্য সাধনা করিতে হইবে—সিদ্ধি স্বতঃই লাভ হইবে। এতাবৎ যাহা বলা হইল, তাহাতে অবশ্যই এ কথাটী ছাত্রের হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে যে, মনুষ্যত্ব লাভ করিতে হইলে, শরীরসর্ব্বস্ব হইলে চলিবে না। কারণ, দেহ, মন ও আত্মার পূর্ণ বিকাশের উপর মনুষ্যত্ব নির্ভর করে। শারীরিক বিকাশের সাহায্য কি প্রকারে হয়, এস্থলে তাহারই বিষয় বলা হইল। অপর অধ্যায়ে মানসিক শিক্ষা ও বিকাশের কথা বলা হইবে।

মানসিক কল্যাণের কথা।

শরীর ও মনের মধ্যে নিত্য সম্বন্ধ আছে। অগ্নি ও উত্তাপের ন্যায় এই সম্বন্ধ অবিচ্ছেদ্য। একের অস্তিত্ব, অপরের উপর নির্ভর করে। শরীর আধার, মন আধেয়। শারীরিক স্বাস্থ্য, মানসিক স্বাস্থ্য-সাপেক্ষ। এ কথাটী কতদূর সত্য, তাহা খুব সাধারণ দুই একটী ঘটনা দেখিলেই বুঝা যাইবে। রাত্রিতে সুনিদ্রার পর, প্রাতঃকালে শরীর সুস্থ বোধ হয়; তখন অতি সহজে পাঠ ও চিন্তা করিতে পারা যায়। আবার দিনমান কঠিন পরিশ্রমে অতিবাহিত করিয়া, সায়াহ্নে দেহ ও মন শ্রান্ত-ক্লান্ত হয়। দৈহিক অবসন্নতার সহিত মানসিক অবসন্নতা আসে। দেহ ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইলে মানসিক চিন্তাদির কার্য্যে বিশেষ ব্যাঘাত ঘটে। শরীর অসুস্থ থাকিলে, শিরঃপীড়াদি

হইলে, পঠনাদি কার্য্যতঃ একবারে অসম্ভব হইয়া উঠে। এইগুলি দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, শরীর সুস্থ না থাকিলে, মন সুস্থ থাকে না। অতএব, জ্ঞানযোগী ছাত্র মানসিক উন্নতি ও বিকাশের জন্য প্রথমতঃ শরীর সুস্থ রাখিতে চেষ্টা করিবে। শরীরকে উপেক্ষা করিয়া মনের উন্নতি সাধিত হইতে পারে না; এ কথা পূর্ব্বাধ্যায়ে বিশেষ ভাবে বলা হইয়াছে। একদিকে যেমন শারীরিক কুশলে মানসিক মঙ্গল হয়, অপর দিকে তেমনই মানসিক স্বাস্থ্যের উপর শারীরিক স্বাস্থ্য নির্ভর করে। মানসিক রোগ হইলে শরীর রুগ্ন ও ক্লিষ্ট হয়। মানসিক অবসাদে শরীর অবসন্ন হয়। মন প্রসন্ন থাকিলে শারীরিক স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়। দুই-চারিটী দৃষ্টান্ত দেখিলেই এ কথাগুলির যাথার্থ্য উপলব্ধি করা যাইবে। উন্মাদ একটী প্রসিদ্ধ মানসিক রোগ। অনিদ্রা ঐ রোগের একটী প্রধান লক্ষণ। নিদ্রা না হইলে শরীর ক্লিষ্ট হয়, নিদ্রাজনিত বিশ্রামের অভাব হেতু শরীর ক্ষয়প্রাপ্ত হয়; অত্যন্ত শোকে দুঃখে শরীর অত্যন্ত অবসন্ন হয়। অতি ত্রাসে পরিপাক-ক্রিয়ার ব্যাঘাত হইতে দেখা গিয়াছে। "চিতা মৃতব্যক্তিকে দহন করে, চিন্তা জীবিতকে দহন করে," "চিন্তা জরা বিনা বার্দ্ধক্য আনয়ন করে" ইত্যাদি প্রচলিত বাক্যও ঐ কথাই সপ্রমাণ করে। আবার যাহারা সর্ব্বদা প্রসন্ন মনে থাকে, তাহারা প্রায় সুস্থ হয়। মানসিক প্রসন্নতা স্বাস্থ্য ও আয়ুঃ বৃদ্ধি করে। ধর্ম্মপরায়ণ সাধু সন্ন্যাসিগণ, সতত সদানন্দ থাকেন। তাঁহারা প্রায়ই শোকদুঃখ-জর্জ্জরিত সাংসারিক ব্যক্তিগণের অপেক্ষা সুস্থ ও দীর্ঘজীবী হয়েন। শরীর ও মনের স্বাস্থ্য যে তাহাদের পরস্পরের স্বাস্থ্যের উপর নির্ভর করে তাহা বুঝাইবার জন্য আর বেশী দৃষ্টান্ত দিবার আবশ্যক নাই। জ্ঞানযোগী ছাত্র মনের শিক্ষার জন্য এবং তাহার উন্নতি ও বিকাশের জন্য মনকে সুস্থ ও প্রসন্ন রাখিবে। অবসন্ন, ক্লান্ত, শ্রান্ত ও রুগ্ন দেহে কুস্তি-কসরৎ,

ব্যায়ামাদি এবং অন্যান্য দৈহিক শিক্ষা যেমন এক প্রকার অসম্ভব হয়, মন ক্ষুণ্ণ, বিমর্ষ, অবসন্ন ও বিকারগ্রস্ত হইলে মানসিক কোন প্রকার শিক্ষাও তেমনই দুষ্কর হয়। অতএব জ্ঞানযোগী ছাত্র, বিদ্যার্থী যুবক, সর্ব্বদা শরীরকে সুস্থ ও মনকে প্রসন্ন রাখিবে।

পূর্ব্বাধ্যায়ে শারীরিক কল্যাণের কথা বলা হইয়াছে। মানসিক কল্যাণের কথা এই অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়। মানসিক কল্যাণ সাধনের পূর্ব্বে, মন কি তাহা জানা আবশ্যক। মনের প্রকৃতি ও ধর্ম্ম কি, তাহার কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া আবশ্যক।

মনোবিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা বলেন যে, মস্তিষ্কে সতত মনের কার্য্য হইতেছে।* শরীরস্থ ধমনী ও শিরায় শোণিত যেমন সতত সঞ্চরমাণ, মস্তিষ্কে মনও তেমনই সর্ব্বদা কার্য্যশীল। জন্মের সহিত ইহাদের ক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছে—মরণের সহিত ইহাদের ক্রিয়া শেষ হইবে। মন সতত কর্ম্মশীল; কখনও অনুভব করিতেছে, কখনও ইচ্ছা করিতেছে,

* মনোবিজ্ঞান (Mental philosophy) অত্যন্ত দুরূহ বিষয়। এতৎসম্বন্ধে নানাপ্রকার মতভেদ হেতু, ইহা আরও দুরূহ হইয়াছে। এ মতভেদ-বিষয়ে আমাদের দেশে একটী সুন্দর কথা আছে। সেটী এই ;—"বেদা বিভিন্নাঃ স্মৃতয়ো বিভিন্না নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নং * * মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ।" বেদ বিভিন্ন, স্মৃতি বিভিন্ন, এমন মুনি নাই যাঁহার ভিন্ন মত নাই, অতএব মহাজন যে পথ অবলম্বন করেন, তাহাই সুপথ। এখানে ছাত্রপাঠ্য পুস্তকে, খুব সাধারণভাবে মনস্তত্ত্ব-বিষয়ক একটী আধটী কথা বলা গেল। বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষ কিসে হয়, তাহাই এখানে বিশেষ ভাবে বলা হইবে। আশা করা যায়, যে সকল ছাত্র মনোবিজ্ঞান ভালরূপে পাঠ করিতে ইচ্ছুক, তাহারা এতৎসম্বন্ধীয় প্রাচীন হিন্দু, গ্রীক ও বর্ত্তমান পাশ্চাত্য দার্শনিকগণের গ্রন্থাদি, জ্ঞান ও বয়োবৃদ্ধির সহিত পাঠ করিয়া তৃপ্তি লাভ করিবে। এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাখানি পাঠে ছাত্রগণের জ্ঞানতৃষ্ণা বৃদ্ধি হইলে গ্রন্থকার বিশেষ সুখী হইবেন।

কখনও বা চিন্তা, বিতর্ক করিতেছে। ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর হইয়া মন কখনও অত্যন্ত ক্লেশ অনুভব করিতেছে ও আহারের জন্য ইচ্ছা করিতেছে, এবং কোথায় খাদ্য পাইবে, কিরূপ খাদ্য পাইবে, তাহা যথেষ্ট ও স্বাস্থ্যকর হইবে কিনা, ইত্যাকার চিন্তা ও বিতর্ক করিতেছে। কথাচ্ছলে, উপরে যাহা বলা হইল, ঐগুলিই মনের প্রধান কার্য্য। মনের কার্য্য, প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত—(১) অনুভূতি, যথা সুখদুঃখ শীতাতপবোধ; (২) ইচ্ছা, যথা সুখপ্রাপ্তির কামনা, দুঃখাদি হইতে দূরে থাকিবার প্রবৃত্তি ও প্রয়াস; (৩) চিন্তা ও বিতর্ক, যথা প্রাগুক্ত কর্ম্মসাধনের যুক্তিযুক্ততা, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য-নির্দ্ধারণ। অনুভূতি হইতে ইচ্ছা বা সংকল্প আসে; বুদ্ধি, সেই ইচ্ছা বা সংকল্পকে নিয়ন্ত্রিত করে ও তাহার গতি নির্দ্দেশ করিয়া দেয়। মনের কার্য্য এরূপ ভাবে জড়িত যে, তাহাদের সীমা ও পার্থক্য নির্দ্দেশ করা তত সহজ নহে। তবে সামান্যতঃ সংক্ষেপে বলিতে গেলে ঐরূপ বলা যাইতে পারে।

চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্ এই পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয়। ইহারা নিরন্তর বিষয়-* সংস্রবে আসিয়া মনের সুখ বা দুঃখ উৎপাদন করে। মন ইহাদের সাহায্যে (স্নায়ুর দ্বারা) অনুভব করে; কোন প্রকার সুখলাভের জন্য অথবা কোন প্রকার দুঃখ হইতে দূরে থাকিবার জন্য ইচ্ছা করে। এই সংকল্পের আদেশে কর্ম্মেন্দ্রিয়গণ কার্য্য করে। এইরূপে অনুভূতি হইতে ইচ্ছা বা সংকল্প এবং সংকল্প হইতে কার্য্য হয়। চিন্তা ও বিতর্ক দ্বারা কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য স্থির হয়। মনের এই চিন্তা ও বিতর্ক-শক্তির নাম বুদ্ধিবৃত্তি। অনুভূতির বিষয় আলোচনার এখানে তাদৃশ আবশ্যকতা নাই। মনের ইচ্ছা শক্তি বা সংকল্পের কথা কিছু বলা যাউক।

* ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থ যথা,—রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ প্রভৃতি।

মানবের স্বাধীন ইচ্ছা আছে কিনা, মানব অবস্থার দাস কিনা ইত্যাদি দার্শনিক কথার বিচারের স্থান ইহা নয়। তবে সাধারণতঃ দেখা যায় যে, মানুষের মধ্যে ইচ্ছাশক্তি অত্যন্ত প্রবল। ইচ্ছাশক্তি যদি নিয়ন্ত্রিত থাকে, আপনার আয়ত্ত থাকে, তবে মানব তাহার সাহায্যে, প্রায় সকল কার্য্যই সম্পন্ন করিতে পারে। পৃথিবীতে মহৎ লোকদিগের জীবনী পাঠ করিলে, তাঁহাদের চরিত্রে ইচ্ছাশক্তি—প্রতিজ্ঞার বল—অত্যন্ত বেশী, ইহা স্পষ্ট বুঝা যায়। ইচ্ছাশক্তিকে সংযত ও কর্ত্তব্য-বুদ্ধির অধীন করিতে শিক্ষা করা উচিত। ইচ্ছাশক্তি অসংযত ও অত্যন্ত প্রবল হইলে মানবের নানাপ্রকার অনিষ্ট হয়। ইচ্ছাশক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করিতে হইলে, এমন ব্যক্তি, এমন স্থান ও এমন বিষয়ের মধ্যে থাকা চাই, যাহাতে ইচ্ছা প্রবল হইবে অথচ অসংযত ভাবে কার্য্য করিতে পারিবে না। এই নিমিত্ত গৃহে, আদর্শ পিতামাতা ও অন্যান্য পরিজনবর্গ, বিদ্যালয়ে সুশিক্ষক, ক্রীড়াস্থলে সৎসঙ্গী ও ভ্রমণস্থলে সুদৃশ্য এবং পাঠে সদ্‌গ্রন্থ আবশ্যক। সতত এইরূপ সংসর্গে থাকিলে ইচ্ছা সদ্বস্তুতে যায় ও সংযত হয়, সুশিক্ষা সহজে হয়। কিরূপে সুশিক্ষা সহজে সাধিত হয়, তাহা দেখান যাই-তেছে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, মন সর্ব্বদা কার্য্যশীল, সর্ব্বদাই কোন না কোন প্রকার ইচ্ছা করিতেছে। আর প্রায়ই কোন না কোন সংকল্প গঠন করিতেছে। তত্তৎ সংকল্প কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য ইচ্ছার আদেশে ইন্দ্রিয়গণ বিষয়-সংস্রবে যাইবে। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত ভাবে যদি কেহ সতত সদ্বিষয় দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে, তবে ইন্দ্রিয়গণ সদ্বিষয়বৃত্তের বাহিরে যাইবার অবসর পাইবে না এবং যাইবার আবশ্যকও হইবে না। এইরূপে সর্ব্বদা সদ্বিষয়ের সান্নিধ্য হেতু সেই বিষয়গুলির সহিত যেন ইচ্ছার একটী সখ্য হয়। অভ্যাস হেতু প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত হয়। তখন আর অসদ্বিষয়ে ইচ্ছা যায় না।

মানসিক শিক্ষার এইটুকু প্রথম অংশ। এই শিক্ষা অভ্যাস-সাপেক্ষ। প্রকৃতি ইহার সাহায্য করে মাত্র। কিন্তু এইরূপ নিয়ন্ত্রণ ও সদিচ্ছা সহজাত নহে অথবা ইহা প্রকৃতির উপর একেবারে নির্ভর করে না। ইহা অভ্যাসগত এবং শিক্ষা ও সাধনা-সাপেক্ষ। এই অভ্যাসবলে শিক্ষার্থীর ক্রমে পিতামাতা এবং শিক্ষকের কথায় ও উপদেশে আস্থা ও শ্রদ্ধা হইবে। সংক্ষেপতঃ তাহার সৎ কথায়, সৎকর্ম্মে এবং সকল সদ্বিষয়ে রুচি হইবে। পিতামাতা বা শিক্ষক, যিনি যে পরিমাণে শিক্ষার্থীর এই রুচি জন্মাইয়া দিতে সাহায্য করেন, তিনি সেই পরিমাণে সুপিতা, সুমাতা বা সুশিক্ষক বলিয়া গণ্য হইবার যোগ্য। মনের এই শিক্ষার দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। ইচ্ছাশক্তির উৎকর্ষে মানবচরিত্রে প্রতিজ্ঞার বল বৃদ্ধি পায়। সদ্বুদ্ধি পরিচালিত ইচ্ছার উপর, সংকল্পের উপর, প্রতিজ্ঞার বলের উপর, জীবনের বহুবিধ কল্যাণ নির্ভর করে। একদিকে মানসিক কল্যাণের জন্য ইচ্ছাশক্তির উৎকর্ষের চেষ্টা করিতে হইবে, অপরদিকে বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষ য়াহাতে সম্যক্‌রূপে হয়, তৎপ্রতি সর্ব্বদা যত্নবান্ হইতে হইবে।

পার্থক্যনির্দ্ধারণে, ভেদজ্ঞানে বা বৈসাদৃশ্যনির্ণয়ে বুদ্ধিবৃত্তির প্রথম উন্মেষের পরিচয় পাওয়া যায়। অতি শিশুও আলোক ও অন্ধকারের প্রভেদ বুঝিতে পারে। অল্প বয়সেই শিশু পরিবার-পরিজনের মধ্যে কে পিতা, কে মাতা, কে আপন, কে পর তাহা চিনিয়া লয়। অতএব দেখা যাইতেছে যে, অতি অল্প বয়স হইতেই বৈসাদৃশ্য-নির্ণয়ের শক্তির উন্মেষ হয়। একদিকে যেমন বৈসাদৃশ্য-নির্ণয়-শক্তি বৃদ্ধি পায়, অপর দিকে আবার সাদৃশ্য-নির্ণয়-শক্তির বৃদ্ধি হয়। এই দুইটী শক্তি যাহাতে বৃদ্ধি পায়, শিক্ষিত হয়, সেইজন্য বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষের উদ্দেশ্যে প্রথমেই পর্য্যবেক্ষণের কথার আলোচনা করা যাইতেছে।

এই গ্রন্থের এক স্থলে বলিয়াছি যে, পুস্তকে গ্রন্থকার চিত্রকরের ন্যায় বর্ণ যোজনা দ্বারা চিত্র অঙ্কন করেন। পুস্তকে ও চিত্রে, মানব-চরিত্রের বিভিন্ন ভাব ও বৃত্তি, প্রাকৃতিক বা ঐতিহাসিক দৃশ্য তাঁহাদের বর্ণনীয় বিষয়। সুলেখক ও কুশলী চিত্রকরের মধ্যে পার্থক্য অল্পই। দুই জনেই 'বর্ণ' যোজনা দ্বারা রচনা করেন। পাঠক ও প্রেক্ষক সেই হিসাবে এক শ্রেণীস্থ। গ্রন্থে ও চিত্রফলকে অন্যের দৃষ্ট বা অনুভূত বিষয়ের প্রতিকৃতি আমাদের দৃষ্টি-গোচর হয়। সুতরাং দুর্গম ও দূরস্থ পদার্থের দৃশ্য, দুর্লভ সুচিন্তা, ভাব ও জ্ঞান পুস্তকে ও চিত্রফলকে প্রকাশ হওয়ায় সুলভ ও সুগম হইয়াছে। আমরা এখন চিত্রশালায় গমন করিলে কত সাগর, গিরি, বন, উপবন, নদ, নদী, নগর ও প্রান্তরের দৃশ্যপট দেখিতে পাই। পাঠাগারে কত সুলেখকের লেখনীনিঃসৃত সুচিন্তা, সুন্দরভাব, উচ্চ-জ্ঞানের কথা এবং দেশ-বিদেশের দ্রষ্টব্যপদার্থনিচয়ের বর্ণনা পাঠ করি। অন্যের অনুভূত জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা এত অনায়াসলভ্য হয় বলিয়া পুস্তক ও চিত্রের এত আদর। মুদ্রাযন্ত্র-প্রচলনের পর হইতে এই জ্ঞান আরও সুলভ হইয়াছে। তাহার ফলে এই হইয়াছে যে, অন্যের উক্তি, ভাব, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা আমরা আত্মগত করিতে অত্যন্ত পটু হইয়াছি। কিন্তু অপর দিকে পর্য্যবেক্ষণ ও মৌলিক চিন্তাশক্তি ক্রমে যেন কমিয়া যাইতেছে। এখন দৈনন্দিন প্রাকৃতিক ঘটনাসমূহ পর্য্যালোচনা করিয়া স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতে ও স্বীয় চেষ্টায় কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে আমরা তত পটু নহি। অন্যের চিন্তার স্রোতে অঙ্গ ঢালিয়া দিয়া চলিয়া যাইবার প্রবৃত্তি বাড়িতেছে। পুস্তক জ্ঞানপ্রচারের অবশ্য একটি প্রধান উপায় এবং এই জন্য সভ্য-সমাজে, ইহার মর্য্যাদাও যথেষ্ট। কিন্তু তথাপি একথা স্বীকার করিতে হইবে যে, পুস্তকাদির বহুল প্রচার হেতু অনেকস্থলে গৌণভাবে,

পর্য্যবেক্ষণ।

অলক্ষিতরূপে পর্য্যবেক্ষণক্ষমতার অপকর্ষ হইতেছে। উক্ত অপকর্ষের এখানেই পর্য্যবসান হয় নাই। আজকাল টীকা-টিপ্পনী ও ব্যাখ্যা-পুস্তকের অত্যধিক প্রচলন হেতু, পর্য্যবেক্ষণ-ক্ষমতা ত দূরের কথা, চিন্তাশক্তিরও অনিষ্ট হইতেছে।

নিজে কিরূপে স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতে হয়, কি প্রকারে সত্য সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয়, জানিতে হইলে, পর্য্যবেক্ষণকে জ্ঞান-লাভের প্রথম সোপান করিতে হইবে।

কলা-বিদ্যা শিখিতে হইলে বিদ্যা-অনুসারে অঙ্গবিশেষের শিক্ষা আবশ্যক। নৃত্যের জন্য পদদ্বয়ের, গীতের জন্যে কণ্ঠের, বাদ্যের জন্য অঙ্গুলির এবং এতত্রয়ের জন্য শ্রবণেন্দ্রিয়ের শিক্ষা আবশ্যক হয়। এ সকল কথা ছাড়িয়া দিলেও সাধারণতঃ লেখাপড়ায় কি দেখা যায়? বিভিন্ন ভাষার বর্ণপরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে চক্ষুর শিক্ষা হইতেছে। ছাত্রদিগের মধ্যে অনেকের তিন প্রকার ভাষার বর্ণের সহিত পরিচয় আছে; যথা (১) বাঙ্গালা (২) দেবনাগর (৩) ইংরাজী বা রোমান। এখন যদি কাহারও নামটী এই তিন প্রকার অক্ষরে লেখা থাকে; আর সেই ছাত্রটী যদি ইংরাজী বর্ণমালা না জানে, তবে তাহার নিজেরই নাম, ইংরাজী অক্ষরে লেখার জন্য সে পাঠ করিতে পারিবে না। অতএব ইহা দ্বারা এই প্রমাণ হইতেছে, দর্শনেন্দ্রিয়ের শিক্ষা আবশ্যক। সেইরূপ আবার যদি ছাত্রগণ চিত্রবিদ্যা শিক্ষা করে, তবে তখন চিত্র-ফলকে কোথায় কোন্ বর্ণ দিলে চিত্র সুন্দর ও ভাব-প্রকাশক হয়, তাহা জানিতে পারিবে। এই জ্ঞানলাভের পর, যদি কেহ, চিত্রবিদ্যাজ্ঞ ছাত্রগুলির সম্মুখে চিত্রফলক অঙ্কনে বর্ণযোজনার নিয়মের ব্যতিক্রম করে, চিত্রে আলো ও ছায়ার সামঞ্জস্য না রাখে, তবে তখনই তাহারা চিত্রকরের ভ্রমপ্রদর্শনে সমর্থ হইবে। কিন্তু তাহাদের পার্শ্বেই যদি চিত্রবিদ্যায় অনভিজ্ঞ কেহ থাকে, আর দেখে যে চিত্রকর সুন্দর মুখা-

কৃতি অঙ্কনের পর, প্রতিকৃতির চক্ষুতে জ্যোতির্ব্যঞ্জক শ্বেতবিন্দু দিল না, তবে তাহাতে যে কি বিষম ভ্রম হইল তাহা চিত্রবিদ্যায় শিক্ষিত ছাত্রগুলি বুঝিতে পারিল, কিন্তু পার্শ্বস্থ ব্যক্তি বুঝিল না। চক্ষুতে শ্বেতবিন্দু দুটীর অভাবে শত চিত্র-চাতুর্য্য সত্বেও মুখখানি ভাবব্যঞ্জক হইবে না। এইরূপে, গীতবাদ্যসম্বন্ধে কর্ণের শিক্ষা আবশ্যক। যে ব্যক্তি সঙ্গীতের সুর, রাগ ও রাগিণী জানে না, তাহার নিকট বেহাগ, বাগেশ্রী দুই সমান। এই সকল দ্বারা ইহা বুঝা যাইতেছে যে, কার্য্য বা বিদ্যাবিশেষের জন্য, অঙ্গবিশেষের শিক্ষা আবশ্যক। পর্য্যবেক্ষণ ব্যতিরেকে এ শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না। অতএব কি প্রকারে সুন্দররূপে পর্য্যবেক্ষণ করিতে পারা যায় তাহা শিখিতে হইবে। এই শিক্ষা এরূপ হইবে, যে, তদ্দ্বারা প্রথম দৃষ্টিতে দৃষ্টপদার্থ নিচয়ের মধ্যে তাহাদের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য উপলব্ধি করিবার সামর্থ্য হয়। সাদৃশ্যের সংখ্যাধিক্য-অনুসারে, শ্রেণীবিভাগ করিতে হইবে। প্রাণিবিদ্যা ও উদ্ভিজ্জবিদ্যার চর্চায়, এইরূপ শ্রেণী-বিভাগের যথেষ্ট উদাহরণ পাওয়া যায়। এখানে দুই একটী উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে। শ্রেণী-বিভাগের সময়, প্রথমে একটী সংজ্ঞা ঠিক করিতে হয় এবং একটী একটী সংজ্ঞা অনুসারে একটী একটী বিভাগ হইবে। এই সংজ্ঞা সাধারণ গুণ-ব্যঞ্জক বাক্যমাত্র। যেমন "জীবন" ও "স্বেচ্ছাগমনাগমন" শক্তি যাহার আছে, সেই চেতন পদার্থের অপর নাম জন্তু। জন্তু সকলকে, আবার, বিভিন্ন গুণ এবং ধর্ম্ম অনুসারে নানা প্রকার শ্রেণীতে বিভাগ করা যায়। যথা ;—(ক) অণ্ডজ ও স্তন্য-পায়ী ; (খ) স্থলচর, জলচর ও উভচর ; (গ) মেরুদণ্ড-বিশিষ্ট এবং মেরুদণ্ডবিহীন। প্রাণিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা আপন আপন রুচি-অনুসারে প্রাগুক্ত প্রণালীতে শ্রেণী-বিভাগ করেন। (ক) চিহ্নিত পর্য্যায়ে প্রাণি-সাধারণের উৎপত্তির কথা বিবেচনা করিবার

সময় প্রথমেই আমরা দেখি, এক শ্রেণীর জীব অণ্ডজ; আর অপর শ্রেণীর জীব জরায়ুজ। শেষোক্ত জীবগুলি স্তন্য দ্বারা পালিত ও বর্দ্ধিত হয়। (খ) এখানে সংজ্ঞার প্রথমগুণ বাসস্থান। বাসস্থান-অনুসারে জীব শ্রেণী—বিভাগ হইয়াছে। (গ) এখানে মেরুদণ্ডের ভাবাত্মক ও অভাবাত্মক বাক্য দ্বারা সংজ্ঞা করিয়া জীবসমূহকে দুই পর্য্যায়ে বিভক্ত করা হইয়াছে। এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, (ক) (খ) (গ) চিহ্নিত তিনটী প্রধানভাগে জীবসমূহকে শ্রেণীবদ্ধ করা যাইতে পারে। ইহাদের মধ্যে আবার অন্তর্বিভাগ আছে। উদাহরণ স্বরূপ এখানে (খ) এর প্রথমটী লইতেছি; যেমন, স্থলচরের মধ্যে মানুষ ও পশু, দুইটী প্রধান বিভাগ। এইরূপে প্রত্যেকটীর সংজ্ঞানুসারে অন্তর্বিভাগ আছে। সে সকল কথা সটীকভাবে পড়িতে ইচ্ছা করিলে প্রথমে ন্যায় ও তৎপরে বিশেষ বিশেষ বিজ্ঞানশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে হইবে। যাহা হউক, এখানে সংক্ষেপতঃ যাহা বলা হইল, তদ্দ্বারা কি প্রণালী অবলম্বন করিয়া, জাতি-বিভাগ, শ্রেণী-বিভাগ ও তদনন্তর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভাগ করা হয়, তাহা কথঞ্চিৎ বুঝা গেল। এক্ষণে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য নির্ণয় দ্বারা দৃষ্ট পদার্থনিচয়ের শ্রেণী-বিভাগে, পর্য্যবেক্ষণশক্তির কি প্রকারে উৎকর্ষ হয় তাহাও কিছু জানা গেল। পর্য্যবেক্ষণ-বিষয়ক একটী গল্প এখানে বলা যাইতেছে। গল্পটী এই:—
আরব দেশের এক নির্জ্জন প্রান্তরে একজন সন্ন্যাসী বাস করিতেন। একদা তিনি সায়াহ্নে কুটীর হইতে বাহির হইয়া ইতস্ততঃ পদচারণা করিতেছেন, এমন সময়ে কতকগুলি মধুমক্ষিকা তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মক্ষিকাগুলিকে দেখিয়াই, তিনি পথের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন,—দেখিলেন যে, পিপীলিকাসকল, শ্রেণীবদ্ধ হইয়া, শস্য মুখে করিয়া যাইতেছে; ইহাতে তাঁহার কৌতূহল আরও বৃদ্ধি পাইল। তখন তিনি মনোযোগসহকারে পথ দেখিয়া কিয়দ্দূর চলিলেন,

যতদূর চলিলেন, তাহাতে দেখিলেন যে, পথের ধূলির উপর, পশুর ত্রিপদ-চিহ্ন রহিয়াছে, ও পথের একপার্শ্বের তৃণগুলি, মুণ্ডিত মস্তকের শিখার ন্যায় স্থানে স্থানে রহিয়াছে। সেই জনমানবশূন্য প্রান্তরে এইরূপ জীবের পদচিহ্ন দেখিয়া তিনি মনে মনে সিদ্ধান্ত করিলেন যে, কোন ভারবাহী পশু যূথভ্রষ্ট হইয়া এই পথে গিয়াছে।

দরবেশ * যখন এইরূপে মনে মনে বিতর্ক করিতেছেন, এমন সময়ে একজন লোক তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "মহাশয়, এদিকে একটী পশু গিয়াছে কি?" দরবেশ বলিলেন, "হাঁ"; তাহার পরই তিনি পশুটীর বিবরণ দিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন, "তোমার পশুটীর একটী পদ খঞ্জ, নয়?" পশুস্বামী বলিল, "ঠিক, মহাশয়;" দরবেশ বলিলেন, "পশুটীর একটী দন্ত ভগ্ন ও একটী চক্ষু কাণা, নয়?" সে বলিল, "সত্য মহাশয়।" অতঃপর দরবেশ বলিলেন, "—পশুটীর পৃষ্ঠে কোন প্রকার শস্য ও মধু ছিল, নয়?" পশুস্বামী আরও বৰ্দ্ধিতবিস্ময়ে বলিল, "তবে ত মহাশয়, সেটীকে খুব ভাল করিয়াই দেখিয়াছেন, এক্ষণে আমার পশুটী আমাকে দিন।" তখন দরবেশ বলিলেন, "বাপু হে, আমি তোমার পশু চক্ষে দেখি নাই।" এই কথা বলাতে, পশুস্বামী অত্যন্ত সন্দিগ্ধ ও বিরক্ত হইল এবং বলিল, "মহাশয়, ঐ পশুর পৃষ্ঠে অন্যান্য দ্রব্যের মধ্যে বহুমূল্য রত্ন লুক্কায়িত ছিল। আপনি রত্ন লইয়া, আমাকে এক্ষণে বঞ্চনা করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। যদি সহজে তাহা না দেন, তবে বিচারার্থ কাজির (মুসলমান রাজার অধীন বিচারক) নিকট চলুন।" প্রকৃতপক্ষে, দরবেশ ঐ পশুও দেখেন নাই, রত্নও লয়েন নাই। কিন্তু তথাপি পশুস্বামী, তাঁহাকে বিচারের জন্য কাজির নিকট উপস্থিত করাইল। কাজিও প্রশ্নাদি দ্বারা এক প্রকার স্থির করিলেন, যে, দরবেশ দোষী।

* আরব দেশে মুসলমানসন্ন্যাসিদিগকে দরবেশ বলে।

কারণ বলিয়া স্থির করা অসঙ্গত। কার্য্যকারণ-নির্ণয়সম্বন্ধে এখানে যাহা বলা হইল, তাহা হইতেই বুঝা যাইতেছে, যে কিরূপে দেখিলে কি ভাবে দৃষ্টবিষয়-সম্বন্ধে যুক্তি প্রয়োগ করিলে, পর্য্যবেক্ষণ ও বিচারশক্তি বৃদ্ধি পায়। পুস্তকের বাহিরে, বাহ্য প্রকৃতি হইতে এই জ্ঞানলাভ করিতে সর্ব্বদা চেষ্টা করা উচিত এবং তাহাই পর্য্যবেক্ষণের প্রশস্ত ও প্রকৃষ্ট স্থল। অন্তরে বাহিরে, পুস্তকে ও প্রকৃতিতে, যেখানেই জ্ঞানান্বেষণ করা যাউক না কেন, এই দুটী শক্তির অর্থাৎ পর্য্যবেক্ষণ ও বিতর্ক-শক্তির সাহায্য সর্ব্বদা আবশ্যক। এই দুই শক্তি, যে পরিমাণে স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইবে, সেই পরিমাণে জ্ঞানলাভ সফল হইবে। অধীত বা দৃষ্ট বিষয় সম্যকরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে, পর্য্যবেক্ষণ অভ্যাস করিতে হইবে এবং বিতর্ক করিতে হইবে। অন্যথা কেবল পাঠ—শুকবৃত্তি মাত্র, উহাতে কেবল স্মৃতির ভাণ্ডার পূর্ণ করা হয়। নিরবচ্ছিন্ন পাঠে স্বাধীন চিন্তাশক্তি ও তাহার ফল কখনও পাওয়া যায় না।

পুস্তক-পাঠপ্রণালী

ক্ষুধা না থাকিলে আহার করা যেমন বিড়ম্বনা, শিখিবার ইচ্ছা না থাকিলে পিতামাতা বা শিক্ষকের তাড়নায় পাঠ করা তদপেক্ষা অধিক বিড়ম্বনা। অতএব সাকাঙ্ক্ষ হইয়া পাঠ করা আবশ্যক। জ্ঞানলাভের জন্য যদি ছাত্রের আগ্রহ থাকে, সৎপুস্তক, সত্যতত্ত্ব জানিবার জন্য যদি সে উৎসুক হয়, তবে স্বতঃই তাহার শিক্ষকের উপর শ্রদ্ধা ও ভক্তির ভাব আসিবে। তখন সে ইচ্ছা করিবে, শিক্ষক সদ্‌গুরু হউন, শিক্ষক যাহা পড়াইতেছেন তাহা যেন হিতকর হয় এবং সত্য হয়।

খ্রীষ্টানদিগের মধ্যে একটী সুন্দর প্রথা আছে।* তাঁহারা ধর্ম্ম-পুস্তকপাঠের পূর্ব্বে, ঈশ্বর-সমীপে এইভাবে প্রার্থনা করেন, যেন

* আমাদের মধ্যেও রামায়ণাদি পাঠের ও শ্রবণের নিয়ম আছে। ভক্তি ও সংযমের সহিত ঐ সকল গ্রন্থ পঠিত ও শ্রুত হওয়া উচিত; এইরূপ নির্দ্দেশ আছে।

কৃপাময় ভগবান, কৃপা করিয়া তাঁহাদিগকে ধর্ম্মগ্রন্থ সত্যভাবে বুঝিবার শক্তি দেন। তাঁহার উপদেশ বুঝিবার জন্য, হৃদয় ও মন উন্মুক্ত করিয়া দেন। বড়ই সুন্দর ভাব! বাস্তবিকই অধ্যয়ন বল, আর অধ্যাপনা বল, সকল কার্য্যের জন্য হৃদয়-মন প্রস্তুত করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত এবং সর্ব্বকার্য্যের প্রারম্ভে নিষ্ঠার সহিত একাগ্র-চিত্তে উপাস্যদেবতার কৃপা ভিক্ষা করা উচিত। জ্ঞানের সহিত ভক্তির যোগ হউক। মানবের জ্ঞান উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হউক; কিন্তু ভক্তি যেন সে জ্ঞানের সহিত মিলিত ও বর্দ্ধিত হয়। অতএব বিদ্যার্থী ছাত্র, হৃদয় ও মনকে প্রস্তুত করিয়া পুস্তক উদ্ঘাটন করিবে এবং শিক্ষকের উপদেশ শ্রবণ করিবে।

ছাত্র জ্ঞানযোগী। আমাদের দেশে যোগের অনুকূল আসন করিবার ব্যবস্থা আছে। অন্যান্য সকল ধর্ম্ম এবং সম্প্রদায়ের মধ্যেও আসনের ব্যবস্থা আছে। আসন ও উপবেশন এমন হইবে, যে তাহা যেন সাধনার সহায় হয়। ছাত্রের পক্ষে অধ্যয়নই সাধনা। অতএব এরূপ ভাবে পড়িতে বসিতে হইবে, যাহাতে দেহের রক্ত-সঞ্চালন অবাধে হয় এবং শারীরিক কোন অনিষ্ট না হয়। ঋজু হইয়া বসিয়া, আলোকের দিকে পৃষ্ঠ রাখিয়া, মুক্তকণ্ঠে পাঠ করা কর্ত্তব্য। মুক্তকণ্ঠে পাঠ করার নানা গুণ। কথায় বলে, আবৃত্তি বোধ হইতেও গরীয়সী। মুক্তকণ্ঠে পাঠ করিলে পঠন ও শ্রবণ দুই কর্ম্ম, এককালে হয়। বাহিরের কোলাহল কর্ণে যাইয়া মনকে চঞ্চল করিতে পারে না এবং অপিচ উহাতে ফুস্‌ফুসের ক্রিয়া ভালরূপে হয়। এই নিয়মগুলি সমস্তই অভ্যাস সাপেক্ষ। অভ্যাসের প্রথমাবস্থা কষ্টকর বলিয়া বোধ হইতে পারে। শয়ান ভাবে অথবা কোন আলস্যবৃদ্ধিকর আসনে পাঠ করা উচিত নহে। বিশ্রামের সময় সম্পূর্ণ ভাবে বিশ্রাম করাই ভাল। অনেকে দণ্ডায়মান হইয়া

অধ্যয়ন করা প্রশস্ত বলেন। পাঠের সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া লওয়া উচিত। পাঠের বিষয়ানুরূপ সময়ের তালিকা করিতে হয় এবং পাঠের পূর্ব্বে, গৃহকর্ম্ম ইত্যাদি যাহা কিছু কর্ত্তব্য সেগুলি সম্পাদন করিয়া, অনন্যকর্ম্মা হইয়া নিবিষ্টচিত্তে পড়িতে বসাই ভাল।

প্রাগুক্ত প্রকারে ও সাকাঙ্ক্ষ হইয়া নিষ্ঠার সহিত পাঠে রত হইতে হইবে। অভিনিবেশসহকারে তদ্‌গতচিত্তে পাঠ করিলে পঠিত বিষয় সহজেই হৃদয়ঙ্গম হয়।

অভিনিবেশ

"মনোযোগ" "অভিনিবেশের" প্রতিশব্দ। মনোযোগ বলিলে কি বুঝায়? "যোগ" এই কথাটী উচ্চারণ করিবামাত্র পূর্ব্বের একটী বিচ্ছিন্ন অবস্থা মনে হয়। এই বিচ্ছিন্নভাব কিসের মধ্যে? না, মন ও বিষয়ের মধ্যে। ইন্দ্রিয় আপন গ্রাহ্য বিষয়ের সহিত মনের যোগ করাইয়া দেয়। এই কার্য্যের নাম মনোযোগ বা অভিনিবেশ। মন কোন বিষয়ে সংলগ্ন হইলে, জলৌকার শোণিত-শোষণের ন্যায় সেই বিষয়ের সারতত্ত্ব গ্রহণ করে।

অভিনিবেশ ব্যতিরেকে অধ্যয়ন সম্ভবপর নহে। অভিনিবেশের মাত্রানুসারে অধীত বিদ্যা আত্মগত হয়। এক সময়ে একটীমাত্র কাজ করিলে, অভিনিবেশের সুবিধা হয়। কোন একটী কার্য্য করিবার সময়ে তদ্বিষয় ব্যতীত অন্য চিন্তা মন হইতে দূর করিয়া দিবে। এইরূপে সমগ্র মন একটী সমগ্র বিষয়ের উপর দিলে অতি দুরূহ এবং জটিল বিষয়ও সহজে হৃদয়ঙ্গম ও আয়ত্ত হইবে।

অভিনিবেশের কতকগুলি অন্তরায় আছে। সেগুলি সম্বন্ধে সাবধান হওয়া আবশ্যক। অনেক সময় দেখা যায়, পঠনশীল ছাত্র, ক্রমাগত পাঠে প্রহরের পর প্রহর অতিবাহিত করে; কিন্তু শেষে পুস্তক ত্যাগ করিবার সময় দেখিতে পায় যে পঠিত অপঠিত অংশ তাহার নিকট সমান। এইরূপে, চেষ্টায় ব্যর্থমনোরথ হইয়া, সে

আপনার শক্তিতে সন্দিহান হয়, অনেক সময় পাঠে বীতরাগ হয়। এই প্রকার ছাত্রদিগের অধিকাংশেরই পাঠপ্রণালী দূষিত। অভিনিবেশের অভাব বশতঃই ঐরূপ ঘটিয়া থাকে। ঐ সকল ছাত্র চক্ষের সম্মুখে পুস্তক রাখে, এবং পুস্তকের বর্ণ-যোজিত পৃষ্ঠা সকল, দর্পণপ্রতিবিম্বিত আলেখ্যের ন্যায় একটীর পর আর একটী দৃষ্টিপথ দিয়া চলিয়া যায়। হস্ত, পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা উল্টাইয়া যায়, চক্ষু দেখিয়া যায়, কিন্তু মন তখন অন্য চিন্তায় রত থাকায়, চক্ষুতে প্রতিবিম্বিত বর্ণযোজনায় ব্যক্ত অর্থ গ্রহণ করে না। পাঠ্য বিষয়ে যদি উদ্যানের উল্লেখ থাকে, তবে হয়ত, বালক কোন দিন কোন উদ্যানে মালীর বিনানুমতিতে পুষ্পচয়ন করিয়াছিল, এবং পরে মালী তাহার পশ্চাদ্‌ধাবিত হইয়াছিল ইত্যাদি কথা ও আনুষঙ্গিক নানা কথা চিন্তা করে; কিন্তু হস্ত এ দিকে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা উল্টাইয়া যায়। এমন সময় হঠাৎ যদি কেহ ডাকে বা কোন শব্দ হয়, তবে তাহার 'চমক' ভাঙ্গিয়া যায়। এরূপ অবস্থায়, পঠিত বিষয় হৃদয়ঙ্গম করা বা স্মরণ রাখা সম্ভবপর কি? এইরূপে পাঠ করিলে, পুস্তক লইয়া উদয়াস্ত বসিয়া থাকিলেও কখনও কিছু হইবে না। হইবে কেবল;—পাঠে অনমুরাগ, ভাগ্যনিন্দা, ও স্মৃতির দোষ। আনুষাঙ্গক ও অপ্রাসঙ্গিক চিন্তা অভিনিবেশের প্রধান অন্তরায়। অপর দিকে, আবার, মনকে সর্ব্বদা গুরুতর বিষয়ে নিরন্তর ব্যাপৃত রাখিতে চেষ্টা করিলে অভিনিবেশের ব্যাঘাত হয়। এই সকল অন্তরায় অভিনিবেশের পথে যাহাতে না আসে, তদ্বিষয়ে সতর্ক থাকা আবশ্যক।

অভিনিবেশের পর, পুস্তক-পাঠে কল্পনার কার্য্যের কথা বলিতেছি।

কল্পনা।

কল্পনার একটী ঐন্দ্রজালিক শক্তি আছে। এই শক্তিবলে লোকে অতীতের কথা বর্ত্তমানে আনিয়া, ভবিষ্যতের অন্ধকারে আলো দিয়া, সকলই জীবন্ত, জাগ্রত ও প্রত্যক্ষ

দেখে। লোকে কল্পনার বলে অন্যের সুখে হর্ষোৎফুল্ল হয়, পরের দুঃখকে আপন করিয়া বিষাদে বিমর্ষ হয়। কল্পনা যদি না থাকিত, তবে উপন্যাস, কাব্য বা চিত্র যাহা কিছু বল, কিছুরই নবীনতা, সজীবতা থাকিত না। এই কল্পনার সাহায্যে, আমরা কাব্যবর্ণিত ব্যক্তির সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করি; কোন প্রাকৃতিক দৃশ্যবর্ণনা পাঠকালে আমরা যেন বর্ণিত স্থানে উপস্থিত হই।

কত যুগ-যুগান্তর অতীত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু আজিও আমরা রামায়ণ-পাঠের সময় সীতার দুঃখে নিতান্ত দুঃখিত হই; মহাভারত পাঠকালীন, দ্রৌপদীর অপমানে ক্রোধান্বিত হই। দুষ্মন্ত কর্ত্তৃক শকুন্তলার প্রত্যাখ্যানে ঋষিকুমারগণের ন্যায় আমরাও বিচলিত ও ক্রুদ্ধ হই। এইরূপে আবার যখন রঘুবংশবর্ণিত পবিত্র প্রয়াগ-সঙ্গমের বর্ণনা পাঠ করি, তখন আমরা কল্পনা-সহযোগে মনোরথে আরোহণ করিয়া বাস্পরথের অগ্রে তথায় উপস্থিত হই। অপরত্র, মেঘদূত-পাঠে রামগিরি নয়নসমক্ষে উপলব্ধি করি। কল্পনার এমনই ঐন্দ্রজালিক শক্তি।

কাব্য, কবিতা, নাটক ও উপন্যাস-পাঠ ব্যতীত অন্যান্য বিষয়ও সম্যক্‌রূপে অধিগত করিবার জন্য কল্পনার আবশ্যক। ইতিহাস, জীবনচরিত এবং কঠোর গণিত ও জ্যোতির্ব্বিদ্যা-পাঠকালে কল্পনার সাহায্য লইলে ঐ সকল বিষয় সুবোধ্য হয়। জড়দেহ, জড়যানের সাহায্যে যে স্থানে যাইতে পারে না, মন কিন্তু কল্পনারথযোগে অবলীলায় তথায় উপস্থিত হইতে পারে। কাল-ব্যবধান বা দূরত্ব তাহার পথের অন্তরায় হয় না। এজন্য, নিয়ন্ত্রিতা কল্পনা আয়ত্তাধীনে থাকিলে, পাঠক ইচ্ছা করিলে, উপন্যাসোল্লিখিত ব্যক্তিগণের কথোপকথন শুনিতে পান; ইতিহাস-বর্ণিত বীরগণের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া কুরুক্ষেত্র হইতে "চিত্রল অভিযান" পর্য্যন্ত সকল যুদ্ধবিগ্রহ করিতে

পারেন। গণিত ও জ্যোতির্ব্বিদ্যা-অধ্যয়নকালে ইহারই সাহায্যে, পাঠক গাণিতিক অণুর গতি নির্ণয় করেন এবং এই সঙ্গে ভ্রাম্যমাণ ভুবনের আহ্নিক, বার্ষিক গতির বিষয় বিচার-বিতর্ক করেন। অতএব দেখা যাইতেছে, যে, মানসিক উৎকর্ষে কল্পনার শিক্ষা অতীব প্রয়োজনীয়। অন্যান্য বৃত্তির ন্যায় এটীকেও নিয়ন্ত্রিত ও শিক্ষিত করিতে হইবে ; আয়ত্ত করিতে হইবে। কল্পনা নিয়ন্ত্রিত ও শিক্ষিত না হইলে, প্রকৃত শিক্ষার অন্তরায় হইবে, সকলপ্রকার চিন্তাই আকাশ-কুসুম হইবে। এই হেতু, কল্পনাকে সংযত ও আয়ত্তে রাখিয়া সত্য ঘটনার অনুবর্ত্তিনী করিতে হইবে এবং স্থলবিশেষে কল্পনা অগ্রবর্ত্তিনী হইয়া সংবাদ আনিয়া দিয়া যুক্তি-বিতর্কের সহায়তা করিবে।

যাহা কিছু সৎ, মহৎ ও সুন্দর, তাহা বুঝিবার চেষ্টা করিতে হইবে।

চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি।

চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির উৎকর্ষ সাধিত হইলে লোকে রসিক, রসজ্ঞ ও রসগ্রাহী হয় ; সর্ব্বতোভাবে গুণগ্রাহী হয়। সৌন্দর্য্যবোধশক্তির বৃদ্ধি পায়। নিন্দাপ্রবৃত্তি এ শিক্ষার বিষম অন্তরায়। এইজন্য ইহা বর্জ্জনীয়। রসালের ভবিষ্য সুমিষ্টফল-প্রসূ সুগন্ধি মুকুলের পক্ষে বালারুণের অরুণিমা-রোধকারিণী কুজ্‌ঝটিকার ন্যায়, বালকের নিন্দা-প্রবৃত্তিই তাহার চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির সমূহ অনিষ্ট করে। নিন্দুক, শূকরের ন্যায়, লোকের অসার ঘৃণ্য বস্তুমাত্র লইয়া আলোচনা করে। কুৎসাপ্রবৃত্তি সর্ব্বদা দমন করিতে হইবে। গুণগ্রাহী ব্যক্তি মধুপের ন্যায়, যাহাতে যে সদ্‌গুণ আছে, তাহাই গ্রহণ করেন। প্রকৃতপক্ষে, যদি কোন যুবককে সদুপদেশ দিতে হয়, তবে এই কথা বলা উচিত যে, সর্ব্বদা উপযুক্ত ব্যক্তিকে প্রশংসা করিতে শিক্ষা করিবে। দেশের বড়ই দুর্ভাগ্য যে, আমাদের বালকেরা অকাল-পক্ক হইতেছে। তাহারা সর্ব্বদর্শী সমালোচক হইতেছে। এখন হইতে তাহারা অপ্রেমিক হইতেছে। জগতে, সৃষ্টিকার্য্যে, প্রকৃতিতে

মঙ্গল, কৌশল ও সৌন্দর্য্য দেখিতে পায় না। তাহারা মনোলোভা সরিৎ শোভা পদ্মে কণ্টকাকীর্ণ মৃণাল আছে বলিয়া,—তাহার জন্ম পঙ্কে বলিয়া,—নিন্দা করে, দুঃখিত হয়; কিন্তু কণ্টকিত মৃণালে পূতিগন্ধময় পঙ্কেও যে ঐরূপ সুন্দর, মধুময়, নয়নরঞ্জন, কমলাপ্রিয় কমল জন্মে ইহা বলিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হয় না—আহ্লাদিত হয় না। যাহাদের মন এইরূপ ভাবে শিক্ষিত হইতেছে, তাহারা নাস্তিক, অপ্রেমিক, বিশ্ব-নিন্দুক হইবে না ত, হইবে কাহারা? বালকগণের মধ্যে এ প্রবৃত্তি দেখিলে মর্ম্মাহত হইতে হয়। যাহাতে এই ভয়ঙ্করবৃত্তি বালকদের মধ্যে বৃদ্ধি না পায়, তজ্জন্য শিক্ষক, অভিভাবক, অধিক কি, সকল হিতকাম ব্যক্তির চেষ্টা করা উচিত। বালক-সাধারণের জন্য, মানবজাতির কল্যাণের জন্য, এই নিন্দা-প্রবৃত্তি, এই অপ্রেমিক অরসিক ভাব দূর করা আবশ্যক হইয়াছে। জ্ঞানপিপাসু, উচ্চাভিলাষ ছাত্র, ছিদ্রান্বেষণ ত্যাগ করিয়া গুণগ্রহণ করিতে শিক্ষা করুক। প্রশংসা করিলে, গুণগ্রহণ করিতে শিখিলে, সেই প্রশংসার পাত্র ও গুণের আধারকে আদর্শ করিতে এবং ক্রমে সেই আদর্শের অনুরূপ হইতে পারা যায়। এই জন্যই উপাস্য দেবতা দ্বারা উপাসকদিগের প্রকৃতি ও চরিত্র বিচার করিতে পারা যায়।

এ বিশ্বমধ্যে বিবিধ বিচিত্র পদার্থের অভাব নাই। সৎ, সুন্দর ও মহান্ দৃশ্যে এ জগৎ পরিপূর্ণ। ইহাতে প্রশংসাযোগ্য, বিস্ময়কর বিষয়ের যদি কেহ অভাববোধ করে, তবে তাহার হৃদয় মন বড়ই সংকীর্ণ বলিতে হইবে। সুকুমার শিশুর সহাস্যমুখে, সচ্চরিত্র সুস্থকায় যুবকের আশা ও উৎসাহব্যঞ্জক মুখাকৃতিতে কি সৌন্দর্য্য নাই? স্নেহময়ী জননীর পুত্রবাৎসল্যপূর্ণ হৃদয়-প্রতিবিম্বিত 'মুখে কি মহৎ কিছু নাই? শিশিরস্নাত বৃক্ষবল্লরী যখন অরুণিমাচর্চ্চিত দেহে নয়নপথে আসে, তখন কি মন মুগ্ধ হয় না? প্রবলবাত্যা ও

ঘন ঘন কুলিশনাদে প্রকৃতির যে রুদ্রমূর্ত্তি হয় তাহা দেখিয়া, কি সভয়-বিস্ময়ের সঞ্চার হয় না? আবার নিস্তব্ধ নিশীথে তারকাখচিত নীল-নভোমণ্ডল দেখিয়া ভক্তি ও বিস্ময়ে, কি মনপ্রাণ আপ্লুত হয় না? প্রকৃতিতে এইরূপ কত কত দৃশ্য রহিয়াছে, তাহা কে গণনা করিতে পারে? অপর দিকে মানব-চেষ্টা-সম্ভূত শিল্প, কলা স্থাপত্য ও ভাস্কর-বিদ্যার পরিচায়ক পদার্থনিচয়, নিয়ত আমাদের নয়নগোচর হইতেছে। একবার নেত্রোন্মীলন করিয়া দেখিলেই হয়! ইচ্ছা করিলে স্বল্লায়াসে এইরূপ কত শত বিচিত্র শোভা সন্দর্শন করিয়া নয়ন-মন তৃপ্ত করিতে পারা যায়। সন্ধ্যার প্রাকালে পুণ্যতোয়া জাহ্নবী বা নীলসলিলা যমুনায় তরণীযোগে * ভ্রমণ করিতে যাইলে, একদিকে শ্রান্তসূর্য্য আরক্তিম হইয়া অস্তাচলচূড়াবলম্বী হইতেছে, অপর দিকে তাহার শেষ রশ্মি সকল সুধাধবলিত সৌধমালায় পতিত হইয়াছে এবং রঞ্জিতসৌধমালা, তরঙ্গিণীর চঞ্চল সলিলে প্রতিবিম্বিত হইয়া উচ্চে, নীচে অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিতেছে দেখিতে পাওয়া যায়। অট্টা-লিকাভ্যন্তর হইতে ক্বচিৎ অট্টহাস্য ক্বচিৎ বা নানা রাগ রাগিণীযুক্ত সঙ্গীত বাদ্যের শব্দ আসিতেছে ও প্রতিধ্বনি তাহা ফিরাইয়া দিয়া রঙ্গ করিতেছে—যেন প্রতিবিম্ব ও প্রতিধ্বনি প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া আপন আপন অনুকরণ-প্রিয়তার পরীক্ষার্থী হইয়া পর্য্যটকের নিকট উপস্থিত হইতেছে বোধ হইবে। কখন বা পর্য্যটক যশঃপ্রার্থী নবীন কবির ন্যায়, সম্মুখে সন্ধ্যালোকরঞ্জিত ছবি দেখিয়া প্রলুব্ধ হইয়া যাইবে এবং পরে সেখানে উপস্থিত হইলে, দেখিবে যে, সে ছবি আরও দূরে চলিয়া যায়, আর অতীতের ন্যায় পশ্চাতে অন্ধকার রাখিয়া যায়। এইরূপে গ্রামে বা নগর-তলবাহিনী নদীতে, নৌকাযোগে ভ্রমণকালে, সাধারণতঃ

* কাশী ও আগ্রার অথবা গঙ্গা ও যমুনা তীরবর্ত্তী কোনও বড় নগরের দৃশ্য।

ঐ প্রকার ঘটনা ও দৃশ্যের একত্র সমাবেশ হইয়া প্রকৃতি ও শিল্পের মধ্যে এক অপূর্ব্ব শোভার সম্মিলন দৃষ্টিগোচর হয়। জানি না, কোন্ পাষাণহৃদয় এই সম্মিলিত শোভা দেখিয়া বিস্মিত ও আহ্লাদিত না হয়? যদি এমন নিন্দুক ও কঠিন কেহ থাকে, তবে সে কেবল পাষাণের ন্যায়, পাষাণহৃদয় লইয়া ভূভার বৃদ্ধি করে মাত্র।

হে শিক্ষার্থী ছাত্রগণ, তোমরা কদাপি ছিদ্রান্বেষী নিন্দুক হইয়া কঠোর হৃদয়ের পরিচয় দিও না। যদি তোমাদের হৃদয় এখন হইতে পাষাণ সদৃশ কঠিন হয়, তবে পিতামাতা, শিক্ষক এবং অন্যান্য হিতৈষিগণের উপদেশগুলি, হিতবচনাবলী, ঊষরক্ষেত্রে রোপিত বীজের ন্যায়, অঙ্কুরিত হইবার পূর্ব্বে নষ্ট হইবে। তাঁহাদের ও তোমাদের এত পরিশ্রম, এত আয়োজন বৃথা হইবে। অতএব এখন হইতে সাবধান হইও।

স্মৃতি।

মানসিক বৃত্তিনিচয়ের মধ্যে স্মৃতির সম্যক্ উৎকর্ষ অতিশয় আবশ্যক। যদি আয়াসলব্ধ রত্ন আয়ত্তাধীনে রাখিতে না পারা যায়, তবে দেহপাত করিয়া রত্নসংগ্রহের আবশ্যকতা কি? মানুষ জ্ঞানলাভ করিয়া, তত্ত্ব সংগ্রহ করিয়া, স্মৃতির নিকট সঞ্চয়ের জন্য সমর্পণ করে। কার্য্যকালে তাহা ব্যবহার করে, ভোগ করে। অন্যথা স্মৃতি যদি বিশ্বাসঘাতক হয়,—তবে বড়ই বিপদ। অন্যান্য বৃত্তিসমূহের ন্যায় স্মৃতির উৎকর্ষও শিক্ষাসাপেক্ষ। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, অপরাপর বৃত্তিগুলির অপেক্ষা স্মৃতি স্বভাবতঃই অধিকতর প্রখর। অনেকের বিশ্বাস, লিপিপদ্ধতি-প্রচলনের পর হইতে, লোকের স্মৃতিশক্তির অপকর্ষ হইতেছে। প্রমাণস্বরূপ তাঁহারা বলেন যে, এই ভারতবর্ষে প্রথম আর্য্যঋষিগণ যখন বেদ-গান করিতেন, গ্রীসে অন্ধ কবি হোমর যখন সমস্ত ইলিয়দ গান করিয়া গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে ভিক্ষার জন্য বেড়াইতেন, তখন অক্ষর-প্রচলন

হয় নাই। তাহার বহুকাল পরে, লোকসমাজে লিপিজ্ঞান প্রচার হয়। বর্ণপ্রচলনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত, বেদ চতুষ্টয় প্রভৃতি, পুরুষপরম্পরায় মুখে মুখে প্রচারিত হইত। যাউক, এতদ্দ্বারা লিপিপ্রচলনের নিন্দা করিতেছি, এরূপ কেহ যেন না বুঝেন। বর্ত্তমান অবস্থায় স্মৃতির সাহায্যের জন্য লিপিপদ্ধতি কতদূর উপকারিণী তাহাও যথাস্থানে বলিব। পূর্ব্বকালের লোকের স্মরণশক্তি এখন অতিমানুষিক বোধ হয়। এখন, বর্ত্তমান সময়ে, কিসে দুর্ব্বলস্মৃতি প্রখর হয়, ও কার্য্যকারী হয়, তদ্বিষয়ে বিবেচনা করা যাউক।

বোধশক্তি, স্মৃতিশক্তির পূর্ব্বগামী হওয়া আবশ্যক। যে বিষয় দেখা যায়, শুনা যায়, অনুভব করা যায় বা পাঠ করা যায়, তাহা সম্যক্‌রূপে বুঝিতে চেষ্টা করিতে হইবে। ঐতিহাসিক ঘটনা মনে রাখিবার জন্য স্মৃতির সাহায্য বিশেষভাবে আবশ্যক। কিন্তু ঐতিহাসিক ঘটনাগুলি যদি ভাল করিয়া না বুঝিয়া কেহ মুখস্থ করিতে চেষ্টা করে, তবে তাহার পাঠের ফল লাভ হয় না। সম্পূর্ণরূপে বুদ্ধিদ্বারা বিচার করিয়া বুঝিয়া, কল্পনার সাহায্যে অতীতকে বর্ত্তমানে আনিয়া প্রত্যক্ষ করিতে হইবে। উদাহরণস্বরূপ আমরা এখানে হল্‌দীঘাটের যুদ্ধের কথা বলিতেছি।

হলদীঘাটের যুদ্ধটী ভাল করিয়া মনে রাখিতে হইলে, দৃষ্টঘটনার মত উহাকে স্মৃতিতে জাগ্রত রাখিতে হইলে, হল্‌দীঘাটের যুদ্ধের পূর্ব্বাপর হেতু ও ফল বুঝিতে হইবে। রাজপুতানা, আরাবল্লী পর্ব্বত, হল্‌দীঘাট, প্রতাপসিংহ, মানসিংহ, আকবর, সেলিম প্রভৃতি নামগুলি কিরূপে সম্বন্ধ তাহা বুঝিতে হইবে। যখন এগুলি বুঝিবে, তখন যুদ্ধের কারণ অনুসন্ধান করিবে। আকবরশাহ কি চাহিয়াছিলেন, আর প্রতাপসিংহ কি দেন নাই, যখন বুঝিবে, তখন প্রতাপের দিকে স্বতঃই তোমার সহানুভূতি যাইবে। যখন দেখিবে, আকবরশাহ রাজপুতের

স্বাধীনতা চাহিয়াছিলেন, আর প্রতাপসিংহ তাহা দেন নাই, নানা দুঃখে কষ্টে, বনে বনে, পর্ব্বতে পর্ব্বতে, কন্দরে কন্দরে, ভ্রমণ করিয়া সেই স্বাধীনতা রক্ষা করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন, তখন স্বভাবতঃই তুমি প্রতাপের পক্ষ অবলম্বন করিবে। তাঁহার সেই রক্তিম পতাকার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তাঁহার "দ্বাবিংশতি সহস্রের" উপর আর একজন হইয়া-গিয়াছ মনে করিবে। ক্রমে হল্‌দীঘাটের যুদ্ধবর্ণনা যতই পাঠ করিবে, ততই তোমার কৌতুহল বাড়িবে, কল্পনা তোমাকে দেশ কাল ভুলাইয়া দিবে। তুমি রুদ্ধশ্বাসে যুদ্ধের জয়-পরাজয় অপেক্ষা করিবে। প্রতাপসিংহ যখন চৈতকের উপর আরোহণ করিয়া আত্মবিপদ ভুলিয়া, স্বদেশের স্বাধীনতা ও সম্মানরক্ষার জন্য উৎসর্গীকৃতপ্রাণ হইয়া মত্তরণকুঞ্জরের ন্যায় শত্রুবিঘাতিমূর্ত্তিতে শত্রুদল দলন করিয়া ক্রমে যেসময়ে সেলিমকে আক্রমণ করিলেন, অশ্বশ্রেষ্ঠ চৈতক যখন সেলিমের হস্তীর গাত্রে, সম্মুখের পদদ্বয় উত্তোলন করিয়া দিয়া শত্রুসংহারে প্রভুর সাহায্য করিল, আর নিমিষের মধ্যে যখন তাঁহার দিকে 'দিন্' 'দিন্' শব্দে মুসলমান সৈন্যগণ ধাবিত হইল, তখন—তখন—প্রতাপকে শত্রু-ব্যূহ মধ্যে দেখিয়া, কয়েক মুহূর্ত্তকাল, তুমি কি বিষম উৎকণ্ঠায় অতি-বাহিত কর, বল দেখি? শেষে যখন চৈতক দ্রুতগতিতে অপরত্র যাইয়া প্রতাপের প্রাণরক্ষা করিল দেখিলে, তখন শ্বাসত্যাগ করিয়া অন্যান্য কথা চিন্তা কর। এখন, বল দেখি, যদি এরূপভাবে কোন বিষয় পাঠ কর, তবে সে বিষয়টী কি কখন ভুলিবার সম্ভাবনা থাকে?

এইজন্যই পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, যে, যাহা পাঠ করা যায়, তাহা ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে, উপলব্ধি করিতে হইবে। অন্যথা বর্ণিত বিষয়টীর প্রত্যেক বর্ণটী পর্য্যন্ত মুখস্থ বলিতে পারিলেও কোন কাজ হইবে না। বোধশক্তি, স্মৃতির পূর্ব্বগামী হইয়াই অনেক স্থলে জ্ঞাতব্য বিষয়টী এত আয়ত্ত করিয়া লয় যে, স্মৃতির, সেখানে আর, বিশেষ

কোন কাজ থাকে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ, বুদ্ধিমান্ ও অল্পবুদ্ধি বালকের জ্যামিতির প্রতিজ্ঞাপাঠ উল্লেখ করা যাইতে পারে। যে বালক প্রতিজ্ঞাটী ভাল করিয়া, তন্ন তন্ন করিয়া বুঝিল, সে আর পুস্তকের ভাষা মুখস্থ করিল না। কিন্তু অল্পবুদ্ধি বালক সেটী ভাল করিয়া না বুঝিয়া পুস্তকের ভাষাটী পর্য্যন্ত মুখস্থ করিতে বাধ্য হয়। এইজন্য কাহার কাহার মত, যে বোধশক্তি অত্যন্ত প্রখর হইলে বালক স্বভাবতঃই স্মৃতির সাহায্য লইতে চাহে না এবং সেইজন্য ঐ বৃত্তিটী অপেক্ষাকৃত উপেক্ষিত হয়। কিন্তু বুদ্ধিমান্ বালকের পক্ষেও কোন বিষয় সম্যক্ রূপে বুঝিয়াই তাহা ত্যাগ করা বিষম ভ্রম। স্মৃতির উৎকর্ষ সম্যক্‌রূপে করা চাই।

এতক্ষণ কোন বিষয় মনে রাখিবার পূর্ব্বে, তাহা ভাল করিয়া বুঝিবার কথা বলা গেল, ইহার পর স্মৃতির উৎকর্ষের দ্বিতীয় উপায় বলিতেছি।

ছাত্রগণ নিত্য নানাপ্রকার বিষয়ের সংস্রবে আসিতেছে, এখন সকলগুলিকে মনে রাখা অসম্ভব ও অন্যায়। অযথা, অসার বিষয়ের ভারে স্মৃতিকে ভারাক্রান্ত করা উচিত নহে। কবে "স্পানিস আর্ম্মাডার" পরাজয় হইলে রাজ্ঞী এলিজাবেথ হংস-মাংস ভোজন করিয়াছিলেন, অথবা কি জন্য বিক্রমাদিত্যের গৃহে একটী মৃত্তিকা নির্ম্মিত জলাধার ও মাদুর মাত্র থাকিত ইত্যাদির উল্লেখ স্মরণ করিয়া রাখিবার জন্য চেষ্টা করা উচিত নহে। তদপেক্ষা, এলিজাবেথের সময় বা বিক্রমাদিত্যের অনুগ্রহে, সাহিত্যের কিরূপ উন্নতি হইয়াছিল, তাহা স্মরণ করিয়া রাখা উচিত; এইজন্য অপেক্ষাকৃত স্মরণীয় বিষয় থাকিতে, অযথা ও অসার বিষয়ের দ্বারা স্মৃতিকে ভারাক্রান্ত করা উচিত নহে। কোন বিষয় বুঝিবার সময়ে বিষয়ের গুরুত্বের তারতম্য বিচার করিতে হইবে। অতঃপর স্মরণীয় বিষয়গুলির শ্রেণীকরণ কর্ত্তব্য, সদৃশ গুণ ও

লক্ষণযুক্ত বিষয়গুলির একটী গুণ ও লক্ষণ মনে রাখিলেই অপর গুলিকে মনে পড়িবে ; এইরূপে অল্পায়াসে, গুরুতর বিষয়গুলি সহজে স্মরণ রাখা যায়।

স্মৃতির তৃতীয় উপায়টী সর্ব্বত্র সমধিক প্রচলিত। যখন দেখা যাইতেছে যে, কিছুতেই বিষয়টী মনে থাকিতেছে না, তখন পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করিতে হইবে। একবার, দুইবার, তিনবার আবৃত্তিতে কিছু হইতেছে না, বেশ—সাতবার, আটবার আবৃত্তি করিবে, নিত্য প্রাতঃকালে দুই একবার আবৃত্তি করিবে, শেষে দেখা যাইবে যে, সপ্তাহকালের মধ্যে সে বিষয়টী স্মৃতির অধিগত হইয়াছে। এটী যে একটী প্রকৃষ্ট উপায়, গৃহপালিত পিঞ্জরাবদ্ধ শুকই তাহার দৃষ্টান্ত। এখানে বলা আবশ্যক যে, অর্থ না বুঝিয়া কণ্ঠস্থ করিতে চেষ্টা করা যুক্তিসঙ্গত নহে।

স্মৃতি যখন প্রখর থাকে, তখন দুর্ব্বোধ্য-সূত্রাদি কণ্ঠস্থ করিয়া, পরে অর্থ ব্যাখ্যা করা ভাল, এরূপ একটী মত এদেশে প্রাচীনদের মধ্যে প্রচলিত আছে। এই মতানুসারে চতুষ্পাঠিতে মুগ্ধবোধ, কলাপাদি ব্যাকরণ, প্রথমে বালকেরা একাবৃত্তি করিয়া যায় এবং পরে বয়োবৃদ্ধিসহকারে, জ্ঞানোন্মেষের সহিত, তাহাদিগকে দ্বিরাবৃত্তি করিবার সময়ে অর্থ বুঝাইয়া দেওয়া হয়। কেহ কেহ বলেন, ইহাতে অনর্থক অধিক সময় নষ্ট হয় ; যাহা হউক এ বিষয়ে মতদ্বৈধ আছে। যেটী যাহার উপকারী, পরীক্ষা করিয়া দেখিলে হয়।

অতঃপর, চতুর্থ উপায়ে, কিরূপে স্মৃতি-শক্তির উৎকর্ষ হয়, তাহা দেখা যাউক। এ উপায় অবলম্বন করিলে, স্মৃতিকে বেশী পরিমাণে বুদ্ধির সাহায্য লইতে হয়। যে বিষয়টী মনে রাখিতে হইবে, তাহার কার্য্য কারণ সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়া লইতে হইবে। তাহার পর, সাদৃশ্যঘটিত ভাব লইয়া স্মৃতির সাহায্য করিতে হইবে। এ স্থলে উদাহরণ দিলে কথাগুলি সহজে হৃদয়ঙ্গম হইবে।

যথা, হিমালয় কোথায় মনে রাখিতে হইবে—হিমালয় হিন্দুস্থানে—এখন সাদৃশ্য নির্ণয় করিয়া দেখা যাইতেছে, যে উভয়ের আদ্য অক্ষর "হ" এখানে "হ" এর সহিত একটী স্মৃতিজড়িত থাকিলে অপরটী মনে করিতে সুবিধা হইতে পারে। অনেকের মতে ইহা তত প্রশস্ত বিধি নহে। ক্ষুদ্র পাঠশালার গুরুমহাশয় এ বিষয়ে উপদেশ দিতে পারেন, কিন্তু কোন সুবিজ্ঞ শিক্ষক ইহার উপকারিতা ও উপযোগিতা স্বীকার করিবেন না।

এ বিষয়ে একটী ক্ষুদ্র গল্প আছে। সেটীতে আমোদ-উপদেশ দুই আছে। গল্পটী এই, এক গৃহস্বামী তাঁহার ভৃত্য দ্বারা গ্রামান্তরে, মধুসিংহ নামক কোন ব্যক্তির নিকট একটী দ্রব্য পাঠাইয়া দেন। দুই গ্রামের মধ্যে একটী ক্ষুদ্র নদী প্রবাহিত। ভৃত্য লোকটীর নামটী স্মরণ করিয়া রাখিবার জন্য এক কৌশল অবলম্বন করিল; সে মনে করিল ও নামটা এখন কে মনে করিয়া রাখে? সুধু—মধুত মিষ্ট এবং সিংহ ত ভয়ানক মনে রাখিলেই চলিবে—এই ভাবিয়া সে নিশ্চিন্ত মনে পথ চলিতে লাগিল—নদীর পরপারে গিয়া নামটী মনে করিতে চেষ্টা করিলে তখন নামটী আর তাহার মনে আসিল না—কেবল মিষ্ট ও ভয়ানক এই দুইটী ভাব মনে আসিল। এখন সে বিপরীত পদ্ধতিতে স্মরণ করিতে লাগিল—শেষে মিষ্ট ভাবের স্থানে "গুড়" ও ভয়ানকের স্থানে "বাঘ" দিয়া "গুড় বাঘের" বাটী অনুসরণ করিতে লাগিল। যাউক, আর বেশী বলিবার আবশ্যক নাই। বিবৃত গল্প হইতে কি প্রকারে সাদৃশ্যঘটিত ভাব লইয়া স্মৃতির সাহায্য হয়, তাহা এই কথার উদাহরণে কিছু বুঝা গেল। পঞ্চমতঃ, ইতিহাসপাঠকালে বর্ণিত বিষয়ের সময় মনে করিয়া রাখিবার জন্য কোন বিশেষ পরিচিত ঘটনার সময় মনে করিয়া রাখা কর্ত্তব্য এবং সেই ঘটনাটীকে মূল ভিত্তি করিয়া অন্যান্য আনুষঙ্গিক ঘটনার পৌর্ব্বাপর্য্য-অনুসারে সময় গণনা করিলেই হয়।

তাহাতে ঐতিহাসিক ঘটনার সময় স্মরণ রাখিবার বিশেষ সুবিধা হইবে। যেমন, কবিশ্রেষ্ঠ কালিদাসের আবির্ভাবকাল নির্ণয় করিতে হইবে। এখানে কি করা উচিত? কোন একটী পরিচিত ঘটনা ধরিয়া লওয়া যাউক। রাজা বিক্রমাদিত্যের নাম সকলেরই খুব পরিচিত। প্রায় সকলেই জানেন যে, বিক্রমাদিত্যের প্রবর্ত্তিত এক বৎসর গণনা এ দেশে প্রচলিত আছে; উহাকে সম্বৎ বলে,—এখন খ্রীষ্টাব্দ ১৮৯৬ এবং সম্বৎ ১৯৫১। আরও জানা আছে যে, কবি কালিদাস বিক্রমাদিত্যের সভায় নবরত্নের মধ্যে একজন ছিলেন। এখন স্থির হইল, কালিদাস ও বিক্রমাদিত্য সমসাময়িক লোক ছিলেন। সুতরাং এখন অনায়াসে কালিদাসের আবির্ভাব-কাল নির্ণয় করা যাইতে পারে। ভবিষ্যতে এই গ্রন্থের পাঠক ছাত্রগণের মধ্যে যদি কেহ ঐতিহাসিক ও প্রত্নতত্ত্বজ্ঞ হয়, তবে আজ সে স্মৃতির উৎকর্ষের জন্য যে উপায় পাঠ করিল তখন সেই উপায় অবলম্বন করিয়া অনেক তত্ত্ব আবিষ্কার করিতে সক্ষম হইবে। যে বিষয়ের বর্ণনার ভাষা কণ্ঠস্থ করিবার আবশ্যক নাই, কেবল বর্ণিত বিষয় মনে রাখিতে হইবে, সেখানে পাঠান্তে মনে মনে একবার পঠিত বিষয় আলোচনা করিলে বিশেষ উপকার হয়। ইহাকে ষষ্ঠ উপায় বলিতে পারা যায়। এটী আবার অন্যান্য স্থলেও বিশেষ উপকারী। পাঠান্তে, অবসরকালে, মনে মনে পঠিত বিষয়ের আলোচনা বিশেষ উপকারী নিয়ম। সপ্তমতঃ স্মৃতির সম্বন্ধে শেষ কথা এই যে, লিখিত কাগজের সাহায্য গ্রহণ করিলে যদিও স্মৃতি দুর্ব্বল হয়, তথাপি লিখিত স্মারকলিপি উপেক্ষার বিষয় নহে। কাষ্ঠ শলাকাজড়িত সূত্র মুখাগ্রের ন্যায়, লিখিত স্মারকলিপি দ্বারা সম্বদ্ধ-ঘটনাপরম্পরাকে সহজে স্মৃতিপথে আনয়ন করা যায়। এই উদ্দেশে পুস্তকের পত্রাভ্যন্তরে সাদা কাগজ সংলগ্ন করিয়া লইতে হয়। অধ্যাপক প্রচারক ও বাগ্মিগণ খণ্ডকাগজে আপন আপন বক্তব্য বিষয়ের স্মারক-

লিপি করিয়া লয়েন। ছাত্রগণও নিজ নিজ পাঠ্য পুস্তকে টীকা-টিপ্পনী সহজে মনে করিবার জন্য এই উপায় অবলম্বন করিতে পারে।

এতক্ষণ কি কি উপায় অবলম্বন করিলে মানসিক বৃত্তিগুলির উৎকর্ষ সাধন হয়, তাহা বলিতে চেষ্টা করা গিয়াছে। কিরূপ ব্যবস্থা করিলে মন সংশিক্ষার উপযোগী হয় তাহাও বলা হইয়াছে এবং অধিগত বিদ্যা দ্বারা কিরূপে মানসিক পুষ্টিসাধন ও উন্নতি হয়, প্রসঙ্গক্রমে তাহারও কিঞ্চিৎ আভাস দেওয়া হইয়াছে। এক্ষণে কিরূপে সাহিত্য, বিজ্ঞান চর্চ্চা করিলে মন পুষ্ট ও উন্নত হয়, অর্থকরী বিদ্যা কি প্রকারে অধ্যয়ন করিলে জীবনে সফলকাম হওয়া যায়, কৃতী হওয়া যায়, কিরূপে সুলেখক ও সদ্বক্তা হওয়া যায়, তত্তৎ বিষয়ে কিছু কিছু বলিয়া এই অধ্যায় শেষ করা যাইবে।

সাহিত্য আলোচনা।

সাহিত্যের উন্নতি জাতীয় উন্নতির পরিচয় দেয়। যখন দেশে রাষ্ট্রবিপ্লব, সমাজবিপ্লব ঘটে, লোকে যখন ধনপ্রাণ লইয়া ব্যস্ত থাকে, তখন সাহিত্যসেবা করিতে পারে না। সে কাল সাহিত্যের বিকাশের অনুকূল নহে। সাহিত্যে রাজনৈতিক ও সামাজিক সভ্যতার প্রতিধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়।

প্রাচীন হিন্দু, গ্রীক ও রোমান ইতিহাসে ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। উনবিংশ শতাব্দীর ইংরাজী সাহিত্য ইহার জাজ্জ্বল্যমান্ দৃষ্টান্ত। এখন ইংরাজের রাজ্যে সর্ব্বত্র শান্তি বিরাজ করিতেছে; লোকে ধনপ্রাণ লইয়া সর্ব্বদা শঙ্কিত নহে; এখন লোকে, অবসর সময় সাহিত্যসেবায় অতিবাহিত করিতে পারে এবং অনেকে, নিরবচ্ছিন্ন সাহিত্যসেবায় জীবিকা অর্জ্জন করিতেছেন। সুসভ্য ইংরাজ-সমাজে এ দৃশ্য অতি সাধারণ। জার্ম্মান এবং ফরাসী-সমাজেও সাহিত্যজীবীর সংখ্যা বিরল নহে।

মঙ্গলময় বিধাতার মঙ্গল বিধানে, ইংরাজ ভারতের রাজা। ভারতের সর্ব্বত্র, এখন শান্তি বিরাজ করিতেছে। প্রজাসাধারণ ধন প্রাণ লইয়া, সুখে কাল কাটাইতেছে। সাহিত্য, শিল্প ও বিজ্ঞানের চর্চ্চা দ্বারা লোকে সমূহ উপকৃত হইতেছে। যতদিন ইংরাজের এই শান্তির রাজ্য থাকিবে, তত দিন ক্রমেই সাহিত্য, শিল্প ও বিজ্ঞানের চর্চ্চা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইবে। এই সুখশান্তিপূর্ণ ইংরাজের রাজ্যে, বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইহা ইংরাজরাজ্যের গৌণ ফল।

কিন্তু মুখরা বঙ্গভাষা চিরকাল ইংরাজের শান্তিসুখপূর্ণ রাজত্বের কথা ঘোষণা করিবে। আজ বঙ্গভাষা, যে কোন ভাষার পার্শ্বে দাঁড়াইতে পারে। তুলনায় সে মলিন হইবে না। বর্ত্তমান সময়ের বঙ্গভাষা, কি শব্দসম্পদে, কি পদলালিত্যে আর কি শ্রুতিমাধুর্য্যে ভারতবর্ষীয় সকল প্রচলিত ভাষার শীর্ষস্থানীয় বলা যাইতে পারে। একমাত্র মহারাষ্ট্রীয় ভাষা ইহার প্রায় সমকক্ষ হইয়াছে। এই ওজোগুণসম্পন্ন বর্দ্ধনশীল বঙ্গভাষা ইংরাজ রাজত্বের একটী প্রধান সুফল বলিয়া চিরকাল পরিগণিত হইবে। দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়, এখন বঙ্গসাহিত্যসেবায় যশ, অর্থ, প্রতিষ্ঠা সকলই লাভ করিতে পারেন। বাঙ্গালা সাহিত্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করা আজ কাল কাহারও চেষ্টার অযোগ্য বিষয় নহে। যদিও আমাদের দেশে এ পর্য্যন্ত দুই চারি জন গণ্যমান্য গ্রন্থকার ব্যতীত অপর কেহ সাহিত্যকেই উপজীবিকা করিতে সক্ষম হয়েন নাই; তথাপি আশা করা যায়, অচিরে আমাদের দেশের শিক্ষিত চিন্তাশীল সুলেখকগণ অনন্যকর্ম্মা হইয়া কায়মনোবাক্যে সাহিত্যসেবায় লক্ষ্মী ও সরস্বতী উভয়কেই তুষ্ট করিতে পারিবেন।

এক্ষণে যাহারা বিদ্যালয়ের ছাত্র, কিছু দিন পরে, তাহারাই, যথে-

চিত শিক্ষা লাভ করিয়া শিক্ষিত সম্প্রদায় ভুক্ত হইবে। তাহারাই সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তি হইবে, প্রাচীনের স্থান নবীন অধিকার করিবে —এই ছাত্রগণই সেই ভাবী নূতন। সমাজ, সাহিত্য ইহাদের নিকট অনেক আশা করে। ইহারাই কালে, আপন আপন রুচি শক্তি ও শিক্ষা অনুসারে, সমাজের বিভিন্ন বিভাগে কর্ম্মে ব্রতী হইবে।

ভবিষ্যতে যে যে অবস্থাতেই থাকুক না কেন, জীবিকা-অর্জ্জনের জন্যই হউক, আর অবসর-রঞ্জনের জন্যই হউক, সাহিত্যচর্চ্চায় বিশেষ উপকৃত হইবে। গোষ্ঠীকথায় হউক, কথোপকথনে হউক, সভা-সমিতিতে হউক, বক্তা ও শ্রোতা দুই চাই, তবে তাহা মনোরম হয়। সুলেখকের যেমন আবশ্যক, রসজ্ঞ সহৃদয় পাঠকেরও তেমনই প্রয়োজন। নতুবা প্রাচীন কবির ন্যায়, অরসিকে রসের নিবেদনের যন্ত্রণা হইতে রক্ষা পাইবার জন্য, লেখককে দেবস্থানে বর ভিক্ষা করিতে হয়। বাস্তবিকই সাহিত্যের পুষ্টির জন্য লেখক ও পাঠক দুইয়ের আবশ্যক। অতএব দেখা যাইতেছে, রসজ্ঞ সহৃদয় পাঠক হইয়াও সাহিত্যের সমূহ উপকার সাধন করা যায়। এখন যাহারা বিদ্যালয়ের ছাত্র, তাহারা যদ্দ্বারা সহৃদয় ভাবগ্রাহী, যথার্থবিদ্ পাঠক হইতে পারে তদ্বিষয়ে সচেষ্ট হওয়া উচিত। যে সকল ছাত্র, ইংরাজী সাহিত্যের রসাস্বাদন করিয়াছে, তাহাদেরও জাতীয় সাহিত্যের প্রতি অনাস্থা প্রকাশ করা উচিত নহে। কি ছাত্রজীবনে, কি ভবিষ্য জীবনে, জাতীয় সাহিত্য, বঙ্গসাহিত্য, বিশেষ যত্নের সহিত সেবা করা কর্ত্তব্য।

বঙ্গীয় ছাত্রগণ, যদ্দ্বারা ছাত্রজীবনে এবং ভবিষ্যতে, সম্যকরূপে সাহিত্যচর্চ্চা করিয়া সুখী হইতে পারে তদ্বিষয়ে দুচারিটী কথা বলা যাইতেছে।

নানা ভাষায় পণ্ডিত হওয়া যে বাঞ্ছনীয়, তাহাতে আর সন্দেহ কি?

কিন্তু নানা ভাষা শিক্ষা করিবার পূর্ব্বে, মাতৃভাষাটী বিশেষ করিয়া শিক্ষা করা আবশ্যক।

বহু ভাষাবিদ্ ডাক্তার কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় একবার কোন বঙ্গবিদ্যালয়ের পারিতোষিক-বিতরণ-উপলক্ষে মাতৃভাষাকে মাতৃস্তন্যের সহিত তুলনা করেন এবং বঙ্গীয় বালকগণকে বাঙ্গালা ভাষার চর্চ্চা করিতে বিশেষ ভাবে উপদেশ দেন। বঙ্গের অমর কবি, বিবিধ ভাষারহস্যবিদ্ শ্রীমধুসূদন শেষে মাতৃভাষা—বাঙ্গালার চর্চ্চায় মনের আশা পূর্ণ করিয়াছিলেন। অতএব, বাঙ্গালা ভাষা, বাঙ্গালা সাহিত্য চর্চ্চা করিবার সময়, প্রাগুক্ত কথাগুলি স্মরণ রাখিতে হইবে। এক্ষণে বঙ্গভাষা আলোচনার সম্বন্ধে অন্যান্য কথা বলা যাউক।

সকল জাতিরই কোন না কোন প্রকারের পুরাণ ও ইতিহাস আছে। সুসভ্য জাতির মধ্যে এগুলি সুন্দরভাবে গ্রন্থে গ্রথিত ও বর্ণিত আছে। অসভ্যগণের মধ্যে মুখে মুখে কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। ভাষা শিক্ষার জন্য, সাহিত্যসেবার জন্য, প্রত্যেক শিক্ষার্থীর আপনার জাতীয় পুরাণ ইতিহাস বা কিম্বদন্তী জানা আবশ্যক। আমাদিগেরও পুরাণ ইতিহাস যথেষ্ট আছে। এখানে আমাদিগের বলিতে, ঠিক "বাঙ্গালীদের" বাঙ্গালা ভাষায় সর্ব্বপ্রথমে লিখিত, কোন পুরাণ ইতিহাসের কথা বলিতেছি না। এখানে আমাদের অর্থাৎ হিন্দু সাধারণের সংস্কৃত ভাষায় লিখিত পুরাণ, ইতিহাস ও মহাকাব্যের কথাই বলিতেছি। সংস্কৃত ভাষায় লিখিত হইলেও, সেগুলি আমাদের। বাঙ্গালা ভাষা, মিশ্র ভাষা হইলেও সংস্কৃতপ্রধান। সংস্কৃত ভাষা, বাঙ্গালা ভাষার জননীস্বরূপ। বঙ্গভাষায় সুপণ্ডিত হইতে হইলে, যথাসম্ভব, সংস্কৃতভাষায় জ্ঞানলাভ করা আবশ্যক।

যাহারা অবস্থা কিংবা কোন কারণ বশতঃ সংস্কৃত ভাষায় জ্ঞানলাভ

করিতে অসমর্থ, তাহাদের পক্ষে প্রসিদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থ সকলের বিশুদ্ধ বঙ্গানুবাদ পাঠ করা সর্ব্বথা কর্ত্তব্য।

অনন্ত রত্নের আকরস্বরূপ, জ্ঞানের অনন্ত উৎস, মহাভারত ও রামায়ণের সুন্দর বঙ্গানুবাদ হইয়াছে। সংস্কৃত ভাষায় ঐ সকল গ্রন্থ পাঠ করিতে না পারিলে, সে গুলির বাঙ্গালা অনুবাদ পাঠ করা একান্ত আবশ্যক। মহাভারত ও রামায়ণের পুণ্য-কথায় বাঙ্গালা সাহিত্য ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত। বাঙ্গালা সাহিত্য-অনুরাগী ব্যক্তির উক্ত গ্রন্থদ্বয় বিশেষভাবে পাঠ করা আবশ্যক। অন্যথা বাঙ্গালা সাহিত্য সম্যকরূপে অধিগত করা বড়ই দুরূহ। প্রাতঃস্মরণীয় বঙ্গের অলঙ্কার কাশীরাম ও কৃত্তিবাসের মহাভারত ও রামায়ণ পাঠ করা কর্ত্তব্য।

উক্ত মহাকাব্যদ্বয়ের ন্যায় সটীক ভাবে না হউক, সংক্ষেপতঃ দুচারি খানি পুরাণ সংহিতা ও ধর্ম্মগ্রন্থ দেখা আবশ্যক। বঙ্গ সাহিত্যের সৌভাগ্যবশতঃ আজ কাল অনেক উদ্যোগী ভদ্র লোক, পুরাণ সংহিতা ও ধর্ম্মশাস্ত্রের উৎকৃষ্ট অনুবাদ প্রকাশ করিতেছেন। সেগুলি হইতে নির্ব্বাচন করিয়া পাঠ করিলে বিশেষ উপকার হইবে।

ইহার পর বাঙ্গালার ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক বিবরণ কিছু জানা আবশ্যক। সাধারণতঃ দেখা যায়, ছাত্রগণ ভূগোল-পাঠে তত মনোযোগী নহে। তাহারা প্রায়ই এই তর্ক করে, যে, আমি থাকিব বাঙ্গালা দেশে, হয়ত, নিজের জেলার বাহিরে উদরান্নের জন্যও যাইবার আবশ্যক হইবে না; তখন মিসরের কোথায় তেলেলকেবীর আছে, আর হনলুলুর লোকেরা কি খায়, তাহা জানিয়া আমার ঐহিক, পারত্রিক কি মঙ্গল হইবে? এই ঔদাসীন্য হেতু তাহারা নিজের দেশের ভৌগোলিক বিবরণটী পর্য্যন্ত পাঠ করে না। ভারতবর্ষের কথা ছাড়িয়া দিলেও, সমস্ত বাঙ্গালা দেশটীতে কয়টী জেলা আছে, কোন্ জেলায় কি কি উৎপন্ন

হয়, কোথায় কোন্ নদী আছে, নদী দ্বারা অন্তর্বাণিজ্যের কি সুবিধা হইতেছে, তাহা অল্প ছাত্রেই জানে। বাঙ্গালার ঐতিহাসিক স্থানগুলির বৃত্তান্ত কয়টী ছাত্র অবগত আছে? তমলুক, নবদ্বীপ, সপ্তগ্রাম, গৌড়, পাণ্ডুয়া, বৌদ্ধ গয়া, রাজগৃহ, মগধ, পাটলীপুত্র প্রভৃতি স্থানের সহিত বাঙ্গালা ইতিহাস যে জড়িত, তাহা কয়টী ছাত্র জানিতে ইচ্ছুক? এই সকল ও অন্যান্য কারণে বাঙ্গালা দেশটীর ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক বিবরণ বিশেষ ভাবে জানা আবশ্যক। দেশটী না জানিয়া দেশের প্রতি কি প্রকারে মমতা হইবে? দেশের প্রতি মমতা না থাকিলে, দেশের ভাষার প্রতি কাহার ভালবাসা জন্মায়? দেশীয় সাহিত্যচর্চ্চার পূর্ব্বে, দেশের কথা কিছু জানা বড়ই দরকার। তাহার পর বাঙ্গালার প্রাচীন ও আধুনিক ইতিহাসও জানিতে হইবে। অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গে আসলে লোকে এক সময় পতিত হইত; আকবরশাহের সভায় তাঁহার দূত বলিয়াছিলেন যে, বাঙ্গালা প্রকৃতির বড় প্রিয় স্থান; ভগবান, গাছের উপরও দু টুকরা রুটী ও এক পেয়ালা জল রাখিয়াছেন। মেকলে সাহেব বলিয়াছেন, সমগ্র নিম্ন বাঙ্গালাটা কাপুরুষের দেশ,—ব্রিটিসের সৈন্যদলে তাহাদের একজনও নাই; ইত্যাকার আপাতঃ অসম্বদ্ধ উক্তিগুলি দেশের ইতিহাস জানিলে ঐরূপ বোধ হইবে না। ঐতিহাসিক সাহিত্য পাঠ করিতে গেলে এতৎসম্বন্ধীয় সংবাদ জানা বিশেষ আবশ্যক। এতদ্ভিন্ন দেশের ইতিহাস পাঠ করিলে দেশের অতীত মহত্ত্বের প্রতি শ্রদ্ধা হইবে, প্রাচীন গৌরবে গৌরব বোধ করিবে। প্রাচীন অবস্থার কথা জানিয়া বর্ত্তমান অবস্থা বিচার করিতে পারিবে। এইরূপে দেশ ও দেশের ইতিহাস অবগত হইতে হইবে এবং সম্ভবপর হইলে, দেশটী ভ্রমণ করিয়াও দেখিতে হইবে। ইহাতে স্বভাবতঃই দেশের প্রতি মন আকৃষ্ট হয়। দেশ ও দেশের যাহা কিছু, তাহার জন্য মমতা হইবে, তখন দেশীয় সাহিত্যসেবক,

দেশের সাহিত্য সহৃদয় হইয়া, সহানুভূতির সহিত আলোচনা করিতে পারিবে। অন্যথা যতই ভাষা শিক্ষা করা যাউক না কেন, তাহাতে কিছু হইবে না, কেবল শব্দাড়ম্বর ও বাক্‌চাতুরী শিক্ষা হইবে। ইহার পর জাতীয় সাহিত্যের ইতিহাস পাঠ করা কর্ত্তব্য। তদনন্তর রুচি ও ক্ষমতা অনুসারে, পাঠক হইয়া হউক আর লেখক হইয়া হউক, আর লেখক পাঠক একাধারে, দুই হইয়াই হউক, সাহিত্য আলোচনা করিবার যোগ্যতা জন্মিবে। পূর্ব্বে যেরূপ বলা গেল সেইরূপ করিলে সাহিত্যচর্চ্চায় সফলকাম হওয়া যায়। বাঙ্গালা সাহিত্য-শিক্ষা ও আলোচনা সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, সাধারণ ভাবে অন্য কোন সাহিত্য-সম্বন্ধেও ঐ পদ্ধতি প্রথমে অবলম্বন করিতে পারা যায়।

ছাত্রগণের বিদ্যালয়ে শ্রেণীপাঠ্য পুস্তকগুলি বিশেষ মনোযোগ-সহকারে পাঠ করা উচিত। সাহিত্যবিষয়ক সংগ্রহ-পুস্তক সম্বন্ধে লোকের নানা মত আছে। যাহা হউক, সেই সংগ্রহ পুস্তকে, যে যে উদ্ধৃত অংশ দেখা যায়, তাহাতে বিভিন্ন প্রকার গ্রন্থকারের বিবিধ বিষয়ের রচনা প্রণালী, ভাষা ও ভাবের নমুনা পাওয়া যায়। ইচ্ছা থাকিলে, অবসর-কালে, ছাত্রগণ ঐ সকল গ্রন্থকারের রচিত মূল গ্রন্থ পাঠ করিয়া পরিতৃপ্ত হইতে পারে। বিদ্যালয়পাঠ্য পুস্তকসম্বন্ধে এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে। এখন অবসরকালে অথবা অন্য সময়ে কি কি পুস্তক পাঠ করা উচিত, তৎসম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। পুস্তক নির্ব্বাচন বড় কঠিন কার্য্য। কোন্ ব্যক্তির কিরূপ লোকের সহিত মিত্রতা আছে, জানিলে আমরা অনেক সময় সেই ব্যক্তির চরিত্র ও রুচির কতকটা পরিচয় পাই। সেইরূপ পুস্তকও লোকের রুচি ও চরিত্র বলিয়া দেয়। অসদ্‌গ্রন্থ বিষবৎ পরিত্যজ্য। আজকাল, সুলভ সাহিত্যের দিনে বিজ্ঞানের নামে, সাহিত্য-প্রচারের দোহাই দিয়া, অনেক অশ্লীল রুচিবিরুদ্ধ পুস্তক প্রচার হইতেছে। সে গুলির নাম

শুনিলে মন মুগ্ধ হয়। কিন্তু পাঠ করিলে ক্ষুব্ধ ও লজ্জিত হইতে হয়। অতএব এই শ্রেণীর পুস্তকপাঠবিষয়ে বিশেষ সাবধান হওয়া আবশ্যক। সাধারণতঃ ভদ্রসমাজে যে যে পুস্তক বহুদিন হইতে প্রচলিত আছে, সে গুলি অগ্রে পাঠ করা প্রশস্ত ও পরামর্শসিদ্ধ। নির্ব্বাচিত পুস্তকসম্বন্ধে, একটু বিবেচনার কথা আছে। একবারে অনেক পুস্তক পাঠের প্রয়াস পাওয়া উচিত নহে। ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, শিক্ষার্থী এক সময়ে একটী কাজ করিবে এবং যাহা কর্ত্তব্য তাহা প্রাণপণে করিবে। এবিষয়ে কীর্ত্তিমান্ মহাপুরুষদিগের উপদেশ স্মরণ রাখিয়া তদ্দ্বারা সর্ব্বদা অনুপ্রাণিত হইয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত, এইরূপ করিলে কার্য্যে সিদ্ধিলাভ হইবে। পুস্তকপাঠসম্বন্ধে এই নিয়ম অবলম্বন করা যাইতে পারে। এক সময়ে একখানি পুস্তক সম্যক্‌রূপে পাঠ করা যুক্তিযুক্ত। এক সময়ে বহুগ্রন্থ পাঠে প্রয়াস পাইলে, কোন পুস্তকই উত্তমরূপে অধ্যয়ন করা যায় না।

সাহিত্যের আলোচনার একটী অংশ পঠন, অপরটী লিখন। পুস্তক পাঠ ও তাহার নির্ব্বাচনের সম্বন্ধে কিছু বলা হইয়াছে। এখন লেখা সম্বন্ধে দুই এক কথা বলিতেছি। অধুনা মুদ্রাযন্ত্রের বহুল প্রচলন হেতু, হস্তাক্ষরের কথা কোথাও বিশেষভাবে উল্লেখ হয় না। পারিবারিক পত্রাদিও ক্ষুদ্র মুদ্রাযন্ত্রযোগে লিখিত হইতেছে। এমন অবস্থায় সাহিত্য-আলোচনা-প্রসঙ্গে ধাত্বর্থ প্রকাশক "লিখন"-পারিপাট্যের কথা কাহার মনে বড় উদয় হয় না এবং ভালও না লাগিতে পারে। আজকাল দেখা যায় যে, ছাত্রসাধারণ হস্তাক্ষরবিষয়ে বড় উদাসীন। আরও দুঃখের বিষয় এই যে, অনেক বিদ্যালয়ে আবৃত্তির ন্যায় হস্তলিপির প্রতি তাদৃশ মনোযোগ দেওয়াও হয় না; ইহার অবশ্যম্ভাবী ফলও সকলে দেখিতেছেন। বিদ্যালয়ে, শত ছাত্রের মধ্যে দুই তিন জনের হস্তলিপি ভাল দেখিতে পাওয়া যায়।

পরীক্ষার্থী ছাত্রগণের হস্তলিপি মন্দ হওয়া অমার্জ্জনীয় ক্রটি। প্রথম দৃষ্টিতে লোকের সৌন্দর্য্য লোককে যেমন আকর্ষণ করে, এবং পরে তাহার গুণাগুণ বিচার করা হয় সেইরূপ হস্তলিপির সম্বন্ধেও বলিতে পারা যায়। লিখিত বিষয়ের ভাব ও ভাষা পাঠান্তে অবগত হওয়া যায়। কিন্তু লিখিত বিষয় দুষ্পাঠ্য হইলে উহা পাঠ করিতে প্রবৃত্তি হয় না, বিরক্তিজনক হয়। আর এক কথা, লেখা বল, আর কথাই বল, সকলই মনুষ্যের মানসিক ভাব প্রকাশক, গৃহীত ও স্বীকৃত, সাঙ্কেতিক চিহ্নমাত্র। এখন, বাক্য ও বর্ণ যদি বিকৃতভাবে উচ্চারিত হয় বা লিখিত হয় তবে সঙ্কেতের প্রথম উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইয়া যায়। এই সকলের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া অন্ততঃ সুকুমার শিল্পবোধেও উত্তমরূপে লিখিতে শিখা উচিত।

এখন ছাত্রগণের রচনা পদ্ধতি ও ভাষার কথা বলিব। প্রথমে যাহাতে, রচনা ব্যাকরণদুষ্ট না হয় তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। বর্ণাশুদ্ধি রচনার সৌন্দর্য্য ও অর্থ বিকৃত করে। এজন্য বিশেষ ভাবে দেখিতে হইবে যে রচনায় ব্যাকরণের ভুল ও বর্ণাশুদ্ধি না থাকে। যখন রচনা এই সকল দোষবর্জ্জিত হইবে, ছাত্রগণ, যখন অনায়াসে সাধারণ বিষয় সহজ ভাষায় লিখিতে সক্ষম হইবে, তখন তাহাদের রচনা, ভাষার ও ভাবের সৌন্দর্য্যের প্রতি মনোযোগ দিতে হইবে। ভাব ও ভাষা অনুরূপ হইলে রচনার সৌন্দর্য্যবৃদ্ধি হয়।

ভাব ও ভাষার মধ্যে সৌষ্ঠব থাকা চাই। রাজকুমারকে কৃষকের বেশ, এবং কৃষককে রাজকুমারের বেশ পরিধান করাইলে সৌষ্ঠব নষ্ট হয়। তেমনই কোন উচ্চ অঙ্গের তত্ত্ব কথা, গ্রাম্যতাদোষযুক্ত ভাষায় বর্ণনা করা উচিত নহে। অথবা সামান্য ঘটনা বাগাড়ম্বর করিয়া বিবৃত করাও সঙ্গত নহে। অঙ্গের সৌষ্ঠব যেমন দেহের সৌষ্ঠব

বৃদ্ধি করে, সেইরূপ বিষয়, ভাব ও ভাষার সৌষ্ঠবে রচনা সুন্দর ও প্রীতিকর হয়। সৌষ্ঠব সৌন্দর্য্যের প্রাণ।

ভাষা যথাসাধ্য শ্রুতিমধুর হওয়া উচিত। সুকণ্ঠ গায়কের কণ্ঠস্বর, তানলয়যুক্ত গানের মাধুর্য্য বৃদ্ধিই করে। বৈষ্ণবকবি জয়দেব আপন গ্রন্থে এই পদলালিত্যহেতু স্পর্দ্ধাসহকারে বলিয়াছেন, যে, তাঁহার পদাবলী শর্করা অপেক্ষা সুমিষ্ট, রসাল হইতে অধিক সরস। জয়দেবের গীতগোবিন্দ যিনি পাঠ করিয়াছেন, তিনি উক্ত কথার সার্থকতা অনুভব করিয়াছেন। কি গদ্যে, কি পদ্যে ভাবের উপযোগী শব্দযোজনাশক্তি সকলেরই বাঞ্ছনীয়। এতাবৎকাল পদ্যরচনায় হ্রস্ব দীর্ঘ, ছন্দঃ যতি মাত্রা প্রভৃতির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া আসা হইতেছে, তাহার উদ্দেশ্য সঙ্গীতের সহিত পদ্যের একান্ত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। পদ্যরচনা এরূপ হওয়া চাই যে, সকল পদ্যই, রাগ-রাগিণী-তানলয়যোগে গীত হইতে পারে। যে কবি যতটুকু পরিমাণে এ বিষয়ে কৃতকার্য্য হইয়াছেন, তিনি তত প্রশংসাভাজন হইয়াছেন। কিন্তু গদ্য রচনাকালে এ গুলির প্রতি সেরূপ লক্ষ্য রাখা হয় না। যাহা হউক, বিষয় কোমল ও ললিত হইলেই তাহাকে ছন্দের শৃঙ্খল পরাইতে হইবে অথবা ছন্দোবদ্ধ করিলেই বিষয়টী ললিত ও সুশ্রাব্য হইবে এরূপ ধারণা ক্রমেই চলিয়া যাইতেছে। গদ্য কাব্য এখন নিতান্ত বিরল নহে এবং আশা করা যায় এমন দিন আসিবে, যখন ভাষা, ছন্দের শৃঙ্খলে না পড়িয়াও, গদ্যাকারে সকল বিষয়ের সকল ভাবপ্রকাশের উপযোগী হইবে। কাহার কাহার এইরূপ মত যে, রচনার বিষয় ও ভাব যদি খুব ভাল হয়, তবে ভাষার জন্য তাদৃশ চিন্তা করিবার আবশ্যক নাই। কৃতী লেখকের প্রতি একথা প্রযুজ্য হইতে পারে, কিন্তু ছাত্র, শিক্ষানবীশ ও নূতন লেখক ভাবদ্বারা পরিচালিত হইয়া ভাষার প্রতি উপেক্ষা করিয়া গেলে বিষম ভুল করিবে। অপর পক্ষে ভাবের প্রতি উপেক্ষা

করিলেও বড়ই অন্যায় হইবে। ভাষার অনুরোধে ভাব সঙ্কোচ করা কোন প্রকারে বিহিত নহে। লেখার ভাব যাহাতে উচ্চ ও সুন্দর হয় তদ্বিষয়ে চেষ্টিত থাকা উচিত। সৎগ্রন্থপাঠ, সৎসঙ্গে বাস এবং সজ্জনের সহিত কথোপকথন ইহার বিশেষ সাহায্য করে। এই জন্য খ্যাতনামা ঐতিহাসিক ও ঔপন্যাসিকদিগের সহিত পরিচিত হইতে চেষ্টা করা উচিত। সমাজে কৃতী লেখকেরা বিশ্বজনীন প্রেমের ধারা প্রবাহিত করেন। চিন্তা ও ভাবের স্রোত তাঁহারা খর বাহিত করেন। সংসার বিষ বৃক্ষের দুই অমৃতোপম ফল—কাব্য ও সুজন সাহচর্য্য—সকলেরই আস্বাদন করা উচিত। সৎপুস্তক পাঠে, ও সল্লোক-সাহিত্যেবাস করিলে ভাবের তরঙ্গ আপনি উঠিবে। সে ভাবলহরীকল্লোল স্বতঃই শ্রুতিগোচর হইবে। হৃদয় যখন ভাবাবেশে পূর্ণ হয়, তখন তাহা রসনায় ধ্বনিত বা লেখনীতে নিঃসৃত হইবে। এরূপ বিশেষ স্থলে, দেখা যায়, ভাষা ভাবের দাসী। সুস্থ দেহে সুস্থ মন থাকিলে, আর সে মন শিক্ষিত, ভাবগ্রাহী ও রসজ্ঞ হইলে, ভাবের অভাব হইবে না। ফুল্ল ফুলে, সস্মিত মুখে, নীলনভস্তলে, কতভাব সংগ্রহ করিবে। মন তখন নিবাত নিষ্কম্প নির্ম্মল, সিন্ধুনীরের ন্যায় প্রশান্ত ও প্রশস্ত হইবে। তাহাতে সামান্য উপলখণ্ড নিক্ষেপের পূর্ব্বে তাহার প্রতি-বিম্বিত এবং পরে তাহা পতিত হইলে ক্ষুব্ধ সলিল জনিত লহরীমালার ন্যায়, মনে ক্ষুদ্র ঘটনাটী পর্য্যন্ত 'প্রতিবিম্বিত হইবে ও ভাবের লহরী উৎপাদন করিবে। যখন মন এমন হইবে তখন ভাবেরও অভাব হইবে না, ভাষারও অভাব হইবে না। ভাব ও ভাষা, প্রকৃতিপুরুষ, পার্ব্বতীপরমেশ্বরের সম্মিলনের ন্যায়, বাগর্থ প্রতিপাদন করিবে। সাহিত্যের আলোচনা সফল হইবে।

অনুশীলন উন্নতির সোপান। যে, অঙ্গটী, যে বৃত্তিটী, যে বিষয়টীর সর্ব্বদা চালনা ও চর্চ্চা করা যায়, সেইটী ক্রমে পুষ্ট, বর্দ্ধিত ও উন্নত হয়।

জীবনের দৈনন্দিন কার্য্যে ইহার বহুল দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। দক্ষিণ হস্তটীর, অপরটীর অপেক্ষা বেশী চালনা হয়, এবং এই জন্য দক্ষিণ হস্ত, বাম হস্তের অপেক্ষা দৃঢ়তর, ক্ষিপ্রতর, ও অধিকতর কর্ম্মঠ। এইরূপে যে কোন একটী অতি সাধারণ মানসিক বা হৃদয়ের বৃত্তি, অথবা গার্হস্থ্য বা সামাজিক বিষয় লইলেও প্রাগুক্ত বাক্যের যাথার্থ্য উপলব্ধি করা যাইবে।

বিজ্ঞান চর্চ্চা।

অনুশীলন যে উন্নতির সোপান, এ কথাটী সামান্য বিষয়ের পক্ষে যেমন সত্য, বৃহদ্বিষয়ের পক্ষেও তদ্রূপ সত্য ও প্রযুজ্য। ভারতবর্ষে, ন্যায়, দর্শন ও যোগের অত্যধিক বিকাশ ও উন্নতি এবং জড়বিজ্ঞান, রসায়ন, চিকিৎসা, কৃষি, স্থপতি ও পূর্ত্ত বিদ্যা প্রভৃতির কোথাও স্বল্প-বিকাশ এবং কোথাও পূর্ব্বের অপেক্ষা অবনতি, ঐ কথারই সাক্ষ্য দিতেছে।

প্রাচীন ভারতে, ঋষিগণ বাহ্য বস্তুতে অনাস্থাপন্ন ছিলেন। তাঁহারা পারত্রিক কল্যাণকামনায় ঐহিক সুখৈশ্বর্য্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেন না। এদিকে আবার, তাঁহারাই তৎকালের সমাজের শীর্ষস্থানীয় ছিলেন। তাঁহাদের উদ্ভাবিত ও নির্দ্দিষ্ট পথ ব্রাহ্মণেতর বর্ণ সকল অনুসরণ করিতেন। কাজেই সমগ্র হিন্দু জাতির মধ্যেই "অনাস্থা বাহ্য বস্তুষু" এই কথার চিহ্ন অল্পাধিক সর্ব্বত্রই পাওয়া যায়। বাহ্য বস্তুর প্রতি আস্থাবান হইয়া, ঐহিক সুখসমৃদ্ধি বাড়াইয়া ও সুলভ করিয়া, জন সমাজের মঙ্গল করিবার বাঞ্ছা বড় দেখা যাইত না। অন্যথা, তাঁহাদের সেরূপ ইচ্ছা থাকিলে, এ সকল বিষয়ে তাঁহারা সমূহ উন্নতিই করিয়া যাইতে পারিতেন। ঐকদেশিক ও আংশিক উন্নতির দোষ আছে। কি প্রাচীন ও বর্ত্তমান ভারতে, আর কি য়ুরোপ ও আমেরিকায়, সর্ব্বত্র তাহা পরিলক্ষিত হইতেছে। প্রাচীন ও বর্ত্তমান হিন্দুগণ, সতত পারত্রিক কল্যাণ কামনায় রত থাকায়

ঐহিক সুখ সমৃদ্ধির জন্য পরমুখাপেক্ষী; এমন কি, আত্মরক্ষায় অপারগ। আর অপর দিকে, ঐহিক ও পার্থিবসুখপ্রধান য়ুরোপীয় ও মার্কিণ জাতি, বিজ্ঞানের আলোচনা দ্বারা জনসমাজের প্রভূত সুখ ও সুবিধার বৃদ্ধি করিয়া তাহাতেই নিমগ্ন আছেন। আধ্যাত্মিক কথা, পরমার্থের কথা, তাঁহারা হিন্দুর ন্যায় বুঝেন না। প্রাচ্য যেন ঘোর সন্ন্যাসী, শীতাতপ নিবারণের জন্য সামান্য চীরখণ্ডের জন্য প্রতীচ্যের ভরসা করেন; আর প্রতীচ্য ঘোর সাংসারিক, ধর্ম্ম জগতের অতি সামান্য সামান্য কথা গুলির জন্যও প্রাচ্যের মুখের দিকে চাহিয়া থাকেন। (খ্রীষ্টান ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক যীশু প্রাচ্য জগতেই আবির্ভূত হন, বুদ্ধ, যীশু মহম্মদ সকলেই এই পূর্ব্ব দিকে উদিত হইয়া ছিলেন সেই জন্যই যেন প্রাচ্য প্রতীচ্যের ধর্ম্মগুরু)।

উভয়েরই, এ দুই পথের চরমে যাইবার প্রয়াস, তত প্রার্থনীয় নহে। মধ্যপথই শ্রেষ্ঠ। বীণার তার খুব শিথিল ভাবে বাঁধিলে বাজেনা আর অত্যন্ত টানিয়া বাঁধিলেও বাজে না। মাঝামাঝি রকমে তার বাঁধিলে ঠিক বাজে—এইরূপ সকল কার্য্যেই জানিতে হইবে। ভারতবর্ষের লোক ধর্ম্মপ্রাণ, ইহা ভাবিলে প্রাণে আনন্দ হয়। হৃদয়ের এই ধর্ম্মপ্রবণতা থাকুক, কিন্তু সেই সঙ্গে, সাংসারিক জীব হইয়া, সংসারের উন্নতি কল্পে, দেশের উন্নতি কল্পে, বিজ্ঞান চর্চ্চা আবশ্যক হইয়াছে। এই বিজ্ঞান চর্চ্চা কেবল পুস্তক পাঠে যেন পর্য্যবসিত না হয়। আজ কাল, ভারতবর্ষীয় শত শত ইংরাজীশিক্ষিত যুবক বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া উপাধি প্রাপ্ত হইতেছেন। কিন্তু তাঁহাদের বৈজ্ঞানিক জ্ঞানে সমাজের ও দেশের সুখ সুবিধা, তাঁহাদের সংখ্যাবৃদ্ধির অনুপাতে কি বৃদ্ধি হইতেছে? না। পর্য্যবেক্ষণ, স্বাধীন ও মৌলিক চিন্তা এবং স্বাবলম্বন ব্যতিরেকে বিজ্ঞানের শিক্ষা কার্য্যতঃ অনুষ্ঠান করা বড় কঠিন।

আমাদের দেশের যুবকগণের এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে হইবে।

সাহিত্য আলোচনার ন্যায় বিজ্ঞান চর্চ্চাও সমধিক পরিমাণে হওয়া আবশ্যক। বিজ্ঞানচর্চ্চা দ্বারা বুদ্ধি বৃত্তির সমূহ উৎকর্ষ হয়। পূর্ব্ব হইতে পর্য্যবেক্ষণ শক্তি যদি সম্যক্‌রূপে বিকশিত হইয়া থাকে, তবে বিজ্ঞান শিক্ষার পক্ষে তাহা বিশেষ উপকারী হয়। বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়াদি করিবার সময় তাহার উপকারিতা বুঝা যায়। বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়াকালে দ্রব্য সমূহের নূতন নূতন গুণ ও ধর্ম্ম আবিষ্কার করিতে সমর্থ হওয়া যায়। মন ও আত্মার সম্যক্ পরিচয় পাইবার জন্য দর্শনশাস্ত্র চেষ্টা করে। বিজ্ঞানশাস্ত্র সেইরূপ, প্রকৃতির সহিত অতি ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচয় করিতে চাহে। ঘনিষ্ঠতা হেতু বাহ্য প্রকৃতির গুণ ও ধর্ম্ম অবগত হয়। তখন তাহাদ্বারা সে প্রকৃতিকে মানবের আয়ত্তাধীন করিয়া দেয়। তখন, মানব, প্রকৃতির শক্তি ও দুর্ব্বলতা জানিয়া, জল ও আগুনকে একত্র করিয়া তাহাদ্বারা শকট চালায়, পোত ভাসাইয়া যায় —নানা কার্য্য করায়। স্বর্গের সৌদামিনীকেও মর্ত্ত্যে আনিয়া বার্ত্তা বহায়।

বিজ্ঞানের উন্নতির সহিত লোকের পরমায়ু ও সুখ বৃদ্ধি হইতেছে। স্বাস্থ্যতত্ত্ব পূর্ব্বাপেক্ষা এখন অনেক উন্নতি লাভ করিয়াছে। চিকিৎসাশাস্ত্রে যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে। বৈজ্ঞানিক সত্য সকল অবগত হইয়া, লোকে এখন গ্রাম, নগর, জনপদ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিতেছে এবং সংক্রামক পীড়াদি হইতে নানা উপায়ে জীবন রক্ষা করিতেছে। এখন লোকে, কৃষিবিজ্ঞান চর্চ্চা দ্বারা, ঊষর ক্ষেত্রকে উর্ব্বরা করিতেছে। 'ইঞ্জিনিয়ারিং' বিদ্যাদ্বারা, অসম্ভব সম্ভব হইয়াছে। শুষ্কভূমি মরুভূমি, স্রোতস্বিনীর কলনাদে প্রতিধ্বনিত হইতেছে,—তাহার চতুর্দ্দিক শস্যশ্যামল হইতেছে। বাইবেলে, মরুভূমিতে নদী প্রবাহিত করা অলৌ-

কিক শক্তির পরিচায়ক বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে*। পুরাণে ভগীরথের স্বর্গের মন্দাকিনীকে মর্ত্ত্যে আনয়নের কথা আছে। এক সময় যাহা কবির কল্পনা বলিয়া বিবেচিত হইত, এখন কার্য্যতঃ তাহা হইতেছে। ঐ দেখ, মিসরের বালুময় প্রান্তরে নীল নদীর কত "ক্যানাল" (খাল) চলিয়াছে। ভারতেও ইহার অভাব নাই যথা "যমুনা ক্যানাল" "গঙ্গার ক্যানাল," "শোণের ক্যানাল প্রভৃতি।" যে সকল জনপদ দিয়া ঐ সকল "খাল" গিয়াছে, সেই সেই জনপদে আর দুর্ভিক্ষে লোক প্রাণত্যাগ করে না; এবং এইরূপে, কোন্ দিকে বিজ্ঞানের ক্ষমতা দেখাইব? সভ্য জগতের প্রত্যেক দ্রব্যটী বিজ্ঞানের ক্ষমতার পরিচয় দিতেছে।

*"Behold, I will do a new thing ; now it shall spring forth ; shall ye not know it ? I will even make way in the wilderness and rivers in the desert," Isaiah chap 43, para 19.

এখন পতিতভারতের উদ্ধারের জন্য, ভারতীয় প্রজাগণের আত্ম-রক্ষার জন্য, আত্মোন্নতির জন্য বহুল বিজ্ঞান চর্চ্চা আবশ্যক হইয়াছে।

সাধারণতঃ লোকের একটী ধারণা আছে যে, বিজ্ঞান, কবিতা কাব্য ও কোমল বৃত্তি নিচয়ের বিরোধী, বিজ্ঞান ধর্ম্ম বিরোধী। এই বিশ্বাসটী বড়ই ভ্রমাত্মক। অধিকন্তু কবিতা, কাব্য, কলা ও ধর্ম্ম উত্তমরূপে বুঝিতে বিজ্ঞান সাহায্যই করে।

অনুবীক্ষণ যন্ত্র যোগে দেখি অতি ক্ষুদ্রতম কীটাণুর শরীরে রক্ত সঞ্চলন হইতেছে, সেও আহার বিহার করিতেছে; এবং দূরবীক্ষণের সাহায্যে সূর্য্যমণ্ডল, চন্দ্রমণ্ডল ও নানা গ্রহ উপগ্রহের গতিও পর্য্যবেক্ষণ করি। যখন এই দুইটী চিন্তা কবি—যখন চিন্তা করি যে এ ব্রহ্মাণ্ডে ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতম এবং বৃহৎ হইতে বৃহত্তম—সকলেই মঙ্গলময়ের বিধানের বশবর্ত্তী—তখন মহান ভগবানের সৃষ্টিরহস্যের কিঞ্চিৎমাত্র

অবগত হইয়া মন প্রাণ কতই না বিস্ময়াবিষ্ট হয় ? ইহাতে কি কবিত্ব নাই ? যে মহান কবির ছন্দে রবি শশী উঠিতেছে, অস্ত যাইতেছে, যাঁহার নীলাম্বর পত্রে গীত লেখা রহিয়াছে, সেই মহান্ কবিকে ও তাঁহার কবিত্ব যথার্থ ভাবে বুঝিতে, বিজ্ঞান সাহায্যই করে। বিজ্ঞান ধর্ম্ম বিরোধী নহে। বিজ্ঞান সত্যের উপর স্থাপিত এবং সদ্ধর্ম্ম ও সত্যে প্রতিষ্ঠিত। ইহারা কখনই পরস্পর বিরোধী নহে।

বাগ্মিতা।

বাচাল হওয়া নিন্দনীয় কিন্তু বাগ্মী হইতে সকলেই ইচ্ছা করে। কি ধর্ম্ম মত, কি রাজনৈতিক মত, আর কি সামাজিক প্রশ্নঘটিত মত বল, সাধারণ্যে সহজে প্রচারের জন্য বাগ্মিতা বড়ই কার্য্যকরী। সকল সমাজেই দুই শ্রেণীর লোক থাকে। ইহার এক শ্রেণী, চালক. অপরটী চালিত, এক শ্রেণী, চিন্তাশীল, স্বাধীন ভাবে আপনাদের মতামত গঠন করিতেছেন, অপর শ্রেণী কেবল তাঁহাদের অনুবর্ত্তন করিতেছে, ও তদ্দ্বারা তাঁহাদের মতের পোষকতা করিতেছে। রাজনীতিক্ষেত্রে বল, ধর্ম্মক্ষেত্রে বল, সমাজ সংস্কারক্ষেত্রে বল, আর যেখানেই বল, প্রথম শ্রেণীর লোকদের মধ্যে মতভেদ জনিত পক্ষভেদ আছে। বর্ত্তমান সময়ে সভ্য সমাজে সংখ্যাধিক্য হেতু প্রাধান্য হয়। সভা সমিতি প্রভৃতি স্থানে কোন প্রশ্নের মীমাংসার সারবত্তা বা গ্রহণীয়তা সভ্যগণের মতাধিক্যের উপর নির্ভর করে। এই রীতিতেই, রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, সমাজনীতি সকলই চলিতেছে। শেষোক্ত শ্রেণী, তাঁহাদের অনুবর্ত্তন দ্বারা দলপুষ্ট করে। তাহাদের অভিমত পাইবার জন্য সভায় বা সাধারণ্যে বক্তৃতা, সুলভ দৈনিক ও সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র প্রভৃতিতে মত প্রচার, বর্ত্তমান যুগের প্রধান লক্ষণ। তাহার পর ধর্ম্মাধিকরণে বিচারপতিগণের নিকট সদ্বিচারের জন্য, ব্যবহারাজীবিগণের বক্তৃতা আবশ্যক। এই সকল কারণে বর্ত্তমান সময়ে বাগ্মিতার এত শক্তি ও মহিমা। এ শক্তি

আয়ত্ত করিবার জন্যও শিক্ষা আবশ্যক। উদ্দীপনাময়ী, প্রাণস্পর্শিনী, অমৃতনিস্যন্দিনী বক্তৃতা শুনিয়া কত পাপী তাপী, পাষণ্ড, পাপের পথ ত্যাগ করিয়াছে—কত কঠিনহৃদয় বিচারক, দোষীর দণ্ড, দয়াপরবশ হইয়া লঘু করিয়াছেন, তাহার কে গণনা করিয়াছে? যখন দেখি দিব্যমূর্ত্তি সুকণ্ঠ, বাগ্মীপুরুষ, সমবেত শ্রোতৃবর্গকে কখন হাসাইতেছেন, কখন কাঁদাইতেছেন, কখন অত্যন্ত উত্তেজিত করিতেছেন, যেন ঐন্দ্রজালিকের ন্যায় মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া তাহাদিগকে আয়ত্তাধীন করিয়াছেন তখন প্রকৃত পক্ষেই সেই অপূর্ব্ব ক্ষমতা লাভ করিবার জন্য প্রাণ আকুল হয়। উদ্দীপনাপূর্ণ বক্তৃতার ঐন্দ্রজালিক শক্তি। সেই মোহিনী শক্তির মধ্যে আসিলে, সম্মোহন হয়, নিজের বুদ্ধি বিচার, সকলই বক্তার অনুযায়ী হয়। তখন মোহবশে বাগ্মী-বিবৃত বর্ণনা যেন সে নয়ন সমক্ষে দেখে—দেখিয়া কখন হাসে, কখন বা কাঁদে। কোথাও বা পাপী আত্মপাপ স্মরণ করিয়া দরবিগলিতনেত্রে, রাগে, ঘৃণায় উন্মত্ত হইয়া উঠে। এইরূপ ক্ষমতাশালী বাগ্মিগণ আপন আপন শক্তি ও রুচি অনুসারে সমাজে ও রাজ্যে, শান্তি-সুখ আনয়ন করিতেছেন। কোথাও বা প্রজা-সাধারণকে উত্তেজিত করিয়া সমাজ ও রাষ্ট্রবিপ্লবে সহায়তা করিতেছেন। সৎলোকের শক্তি সর্ব্বত্র ও সর্ব্বদা দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনে নিয়োজিত হয়। শিক্ষার্থী যুবকগণ সুস্থ শরীরে সুস্থ মনে, ধর্ম্মভীত হইয়া রাজ্যের ও সমাজের নিয়মের প্রতি সতত শ্রদ্ধাবান্ হইবে। এরূপ অবস্থায় বাগ্মিতা তাহাদের অশেষ কল্যাণকরী হইবে।

অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় বাগ্মিতারও একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্র আছে। যাহারা উত্তর কালে সমাজ ও রাজ্যের কল্যাণকামনায় এই শক্তি নিয়োজিত করিতে ইচ্ছুক, তাহাদিগকে সেই শাস্ত্র পাঠ ও অনুশীলন করিতে হইবে। এস্থলে সাধারণ ভাবে সংক্ষেপতঃ কি উপায়ে এই

শক্তির উৎকর্ষ সাধন হয় তাহা বলিতেছি। প্রায়শঃই দেখা যায়, যাহাদের আবৃত্তি শুদ্ধ, তাহারা শিক্ষা ও চর্চ্চা করিলে বাগ্মী হইবার উপযুক্ত হয়। বাগ্মী হইতে হইলে কণ্ঠস্বর উচ্চ, মধুর ও পরিষ্কার হওয়া আবশ্যক। প্রত্যুৎপন্নমতি ও উপস্থিত বক্তা হইতে হইবে। সৎভাব, সরলভাবে বলিতে হইবে। এমন ভাবে বলিতে হইবে যে শ্রোতার চিন্তা বক্তার চিন্তার অনুগামী হয়,—কারণ যখন লোকে বক্তৃতা শুনে, তখন বিবৃত বিষয় স্বতন্ত্রভাবে চিন্তা করিবার অবসর পায় না, বক্তার তাহা দেওয়াও উচিত নহে, তাহাতে রসভঙ্গ হয়। অনেক স্থলে বক্তা সাধারণ্যে বক্তৃতা দিবার পূর্ব্বে গৃহে তাহা লিখিয়া কণ্ঠস্থ করিয়া নির্জ্জনে আবৃত্তি করিয়া প্রস্তুত হইয়া আসেন। অথবা বক্তব্য বিষয়ের স্মরণীয় কথাগুলি লিখিয়া লয়েন। উনবিংশশতাব্দীর ইংলণ্ডের একজন শ্রেষ্ঠ বাগ্মী * এই উপদেশ দেন,–যে বক্তৃতার ভাষা মধুর করিবার জন্য বহুল কবিতা পাঠ করা আবশ্যক। বক্তৃতাকালীন নিজে অবিচলিত থাকিতে হইবে ও মুদ্রাদোষ বর্জ্জন করিতে হইবে।

* ভারতহিতৈষী জন ব্রাইট সাহেব।

গোষ্ঠীকথা ও কথোপকথন।

মূল্য বিনিময়ের জন্য সমাজে মুদ্রা প্রচলিত, আর ভাব বিনিময়ের জন্য কথা প্রচলিত। মুদ্রার সহিত মূল্যের যেমন অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ বাক্যের সহিত অর্থের সেইরূপ সম্বন্ধ। এতদুভয়ই বিনিময় কার্য্য সুলভ ও সহজ করিয়াছে। পারিবারিক সম্মিলন, সায়াহ্নসমিতি, সুধীসমাজ, বন্ধু সমাগম, সময়োপযোগী ভাব বিনিময়ের প্রকৃষ্ট স্থান। এ সকল শুভ উপলক্ষ সুশিক্ষার বড় অনুকূল। এই প্রীতিসম্মিলনে অনেক সময়ে রসনার সার্থকতা হয়। সুতরাং ইহাতে যোগ দিতে কেহই বড় অনিচ্ছুক নহে। নির্দ্দোষ আমোদ-প্রমোদ ও সেই সঙ্গে সুশিক্ষার সুযোগ, এমনটী আর বড় দেখা যায় না। এই সকল সম্মিলনে কোথাও

গীতবাস্ত, কোথাও ক্রীড়াকৌতুক, কোথাও হাস্যপরিহাস, কোথাও বা কেবল গল্প হয়। এবং কোথাও বা পূজ্যপাদ প্রাচীনদের সরলরসপূর্ণ বাক্যালাপে, স্থানটী সজীব সরগরম হইয়া উঠে। এখানে রচনা পাঠ হয় না, বক্তৃতা হয় না, তর্কবাদানুবাদ হয় না—হয় যাহা, তাহা উপরে বলিলাম,—আর হয় পরস্পরের অভিজ্ঞতা ও বিচারলব্ধ মতামত প্রকাশ ও তাহা হইতে শিক্ষা। আমাদের দেশে এ সকল দৃশ্য বড় বিরল, কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় এই যে স্থানে স্থানে লোকে এইরূপ অনুষ্ঠানের উপকারিতা বুঝিতেছেন এবং তদ্রূপ অনুষ্ঠান করিতেছেন।

সকল সভ্য সমাজেই এইরূপ হওয়া উচিত। সাধারণ ভাবে নির্ম্মল আমোদ-প্রমোদ. জ্যেষ্ঠে কনিষ্ঠে, প্রাচীনে নবীনে, বালকে বৃদ্ধে, সম্মিলিত হওয়া উচিত। এই প্রকার সম্মিলনে, বালক, যুবক, সামাজিক রীতিনীতি শিষ্টাচার শিক্ষা করিবে। ভদ্রসমাজে, সহাস্য-মুখে সুরসিক হইয়া কথাবার্ত্তা কহিতে শিখিবে। বড় দুঃখের বিষয় যে এই শিক্ষাটীর প্রতি আমরা আদৌ মনোযোগ দিই নাই। এই জন্য আমরা বর্ষীয়ানদিগের নিকট স্বচ্ছন্দভাবে সহাস্যমুখে অথচ সসম্ভ্রমে কথা কহিতে পারি না। ভদ্রসমাজে হয় ত একবারে নীরব হই, অন্যথা বাচালতা প্রকাশ করি। কথোপকথনের নিয়ম শিক্ষা করা উচিত। কথোপকথন কি প্রকারে সরস, মনোজ্ঞ ও সকলের তৃপ্তিকর হয়, কি কথা কহিলে সকলে সমান ভাবে যোগ দিতে পারে, এগুলি জানা বড় আবশ্যক। অন্যথা দেখিতে পাই কোথাও কেহ বাচালতা করিয়া কোথাও অঙ্গভঙ্গি করিয়া বা বিদূষক হইয়া বিরক্তি বা হাস্যোৎপাদন করে। কোথাও বা কেহ আত্মকথা এত বেশী পরিমাণে কহে, যে লোক অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠে। যদি কেহ স্পষ্টবক্তা উপস্থিত থাকে ত বক্তার দোষ দেখাইয়া দেয়। আর নহিলে সকলকেই শিষ্টাচারের

বশবর্ত্তী হইয়া নীরবে অসভ্যতা ও কুরুচির অনুমোদিত আত্মকথা শুনিতে হয়।

গোষ্ঠী কথায় বা কথোপকথনে বক্তা শ্রোতা দুইই চাই। কথার উপর কথা কহিলে রসভঙ্গ হয়, গোল হয়। অতএব এ সম্বন্ধে সাবধান হওয়া উচিত। প্রসঙ্গ, সময় ও স্থানের উপযোগী হইবে; কথাবার্ত্তা সহৃদয়, সরল ও সরস হইবে; প্রসঙ্গ এমন হইবে, যাহা অধিকাংশের পরিচিত এবং সকলে তাহাতে যোগ দিতে পারে। এই সকল উপলক্ষের জন্য কৌতুক কথা, উপকথা, মহৎ জীবনের আখ্যায়িকা বড় উপাদেয় হয়। শিক্ষার এই অংশের প্রতি দৃষ্টি রাখিলে, গৃহ ও সমাজ, পবিত্র ও সুখের স্থান হইবে। তাহা শিক্ষা ও আমোদ দুই দান করিয়া মনের পুষ্টিসাধন করিবে।

বৃত্তিশিক্ষা।

দেশে এমন একটী সময় ছিল, যখন লেখাপড়ায় পণ্ডিত হইলেই ধনী হইতে হইবে, এরূপ ধারণা লোকের ছিল না; অধিকন্তু লোকের ধারণা ছিল যে, যিনি দেবী সরস্বতীর সেবা করেন, চঞ্চলা কমলা তাঁহার প্রতি বিরূপা থাকেন। যে সকল গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়াতে ব্যবসায়ী প্রকাশক ধনী হইতেছেন, সেই সকল পুস্তকের রচয়িতাগণ দরিদ্রভাবেই জীবন কাটাইয়া গিয়াছেন।

যে অন্ধ কবির জন্মস্থানের গৌরবলাভের জন্য আজ সাতটী স্থান পরস্পরে প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়াছে, তিনি জীবদ্দশায় গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে ভিক্ষা করিয়া উদর পূর্ত্তি করিয়াছেন। সেইজন্য বলিয়াছিলাম, যে লেখাপড়া শিখিলেই ধনেশ্বর হইতে হইবে, এরূপ ধারণা এক সময়ে ছিল না। এই আমাদের দেশেই, শাস্ত্র, সংহিতা, দর্শন, মীমাংসাকার পূজ্যপাদ ঋষিগণ তাহার অপর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। আজ যাঁহাদের পবিত্র গ্রন্থ সকল প্রকাশ করিয়া লোকে যশ অর্থ, প্রতিষ্ঠালাভ করিতেছেন,

তাঁহারা তাঁহাদের জীবনকালে হয়ত হরিতকী, আমলকী ও চীরকষায় বস্ত্রের অধিক কিছু ভোগ করিতে পারেন নাই। আজ যাঁহাদের অমৃত ময়ী বাণী লোকে সুলভ মূল্যে প্রকাশ করিয়া দুর্লভ ধন সুলভ করিয়াছেন—ধনেশ্বর হইয়াছেন, একদিন তাঁহাদের জীবদ্দশায় সেই পূজ্যপাদ ঋষিগণ, তাঁহাদিগের পিতৃশ্রাদ্ধে পিণ্ড সংগ্রহ করিতে কত কষ্ট করিয়াছেন।

আমরা সকলেই উঞ্ছবৃত্তি কথা শুনিয়াছি। কথাটীর অর্থ "ক্ষেত্রের স্বয়ং পতিত শস্য সংগ্রহ করিয়া তদ্দ্বারা প্রাণধারণ করা।"

পুরাকালে অনেক ঋষি যোগ তপ করিতেন এবং জ্ঞানালোচনাও করিতেন এবং ঐ বৃত্তিদ্বারা জীবন ধারণ করিতেন। জ্ঞানলাভ করার সহিত অর্থ লাভের বাসনা তখন জড়িত ছিল না; কিন্তু 'তে হি নো দিবসা গতাঃ'—আমাদের সে দিন গিয়াছে। পিতামাতা, সন্তানকে বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিয়াই আশা করেন যে, পুত্র যথেষ্ট অর্থ আনিলে তবে বিদ্যার সার্থকতা হইবে। তাঁহারা পুত্রের শিক্ষার জন্য অর্থ ব্যয় করিয়া হিসাব করেন—মূলধন ও সুদ হিসাবে এত হইল, এখন লাভের অঙ্কে সন্তান কি আনে দেখা যাউক—আর, যে সন্তান বিদ্যালয়ে বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়া ব্যবসায় বুদ্ধির অভাবে সরল ও সাধারণ ভাবে জীবন কাটায়—সমাজ তাহাকে নিন্দা করে—কুটুম্ব-সমাজে সে উপেক্ষার পাত্র হয়। কি পরিবর্ত্তন! সমাজ এতই অধঃপতিত হইয়াছে—সাধু, সুধীর সম্মান জানে না—যদি তাহা জানিত তবে কি এমন হইত?

এখন ইংরাজি পড়িলেই সরকারের অধীনে কোন কর্ম্ম করিতে হইবে—অথবা চিকিৎসক বা ব্যবহারাজীবী হইয়া প্রচুর অর্থলাভ করিয়া ভোগ বিলাসে জীবন অতিবাহিত করিতে হইবে এই আকাঙ্ক্ষাই প্রবল হয়।

এ আকাঙ্ক্ষা এতই প্রবল হয় যে, লোকে আপন আপন বৃত্তি ছাড়িয়া দিতেছে—ইহাতে পরোক্ষভাবে দেশের শিল্প বাণিজ্যের অবনতি হইতেছে। অর্দ্ধ শিক্ষিত অল্প শিক্ষিত লোকে, রাজদ্বারে বিফল মনোরথ হইয়া বৃত্তিব্যবসায় ত্যাগ করিয়া দারিদ্র্য হেতু উচ্ছৃঙ্খল হইতেছে, সমাজদ্রোহী হইতেছে, এই সকল দেখিয়া শুনিয়া মনে হয়, বুঝি বা প্রথম যে মুহূর্ত্তে উচ্চশিক্ষিত দেশীয় যুবককে নিরপেক্ষ রাজা, উচ্চপদ দিয়াছিলেন, সেটী অশুভ। তাহারই দৃষ্টান্তেই বুঝি বা আজ লোকে দলে দলে পালে পালে বৃত্তিব্যবসায় ত্যাগ করিয়া একই দিকে দৌড়িতেছে ও নিরাশ হইয়া হা! হা! করিতেছে।

কেবল মানসিক শ্রমে আর অর্থ উপায় হয় না। এখন দেহ মন দুই নিয়োগ করিয়া বিদ্যা ও অর্থ অর্জ্জন করিবার সময় আসিয়াছে। ঐকদেশিক শিক্ষা এবং ঐকদেশিক অর্জ্জন স্পৃহা ও চেষ্টা উভয়ই নিন্দনীয়। শরীর ও স্বাস্থ্যকে উপেক্ষা করিয়া কেবল মানসিক শিক্ষায় মানুষ মানুষ হয় না, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি, আবার মন ও মানসিক শিক্ষাকে উপেক্ষা করিয়া কেবল শরীর ও শারীরিক বল লইয়া থাকিলেও বীর হয় না। যুগ ধর্ম্মের লক্ষণ দেখিয়া চলাই প্রাজ্ঞের কার্য্য। এখন কেবল শারীরিক শ্রমসাধ্য কার্য্যদ্বারা অর্থাগম হইবে না। অথবা কেবল নিরবচ্ছিন্ন লেখাপড়ায় জীবিকা উপার্জ্জন যথেষ্ট হয় না। এতদুভয়ে সম্মিলিত শ্রম ফলদায়ী হইতেছে। এখন সমাজে অজ্ঞ সূত্রধর অথবা কেবল জ্যামিতিজ্ঞের তত আদর নাই, কিন্তু যদি একজন কুশলী জ্যামিতিজ্ঞ সূত্রধর পাওয়া যায়, তবে তাহারই সমধিক আদর হইবে। আজ কাল পরিশ্রমের মূল্য এই 'সম্মিলন নীতি' দ্বারা অল্পে অল্পে চালিত হইতেছে।

শারীরিক শ্রম ও মানের জ্ঞান এখনও একত্র সম্মিলিত হয় নাই। কিন্তু আর বেশী বিলম্ব নাই। রাজা ও শিক্ষিত লোকে কার্য্যবিশেষের

সম্মান বৃদ্ধি করেন। দেশে, একটী শিল্প শিক্ষার আকাঙ্ক্ষা দেখা যাইতেছে। আমাদের রাজপুরুষেরা এই শিক্ষা বিস্তারের জন্য বিদ্যালয়, কারখানা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করিতেছেন এবং কালে এই বিদ্যালয়ের শিক্ষিত লোককে, রাজা উপযুক্ত বেতনে কর্ম্ম দিয়া প্রতিপালন করিবেন। তখন দেখিব, সমাজে শিক্ষিত ভদ্রসন্তানগণ সূত্রধর, কর্ম্মকার কিংবা তন্তুবায়ের কর্ম্ম গ্রহণ করিয়া সেই সকল ব্যবসায় যথেষ্ট উন্নতিসাধন করিতেছেন ও প্রচুর অর্থ লাভ করিয়া প্রতিষ্ঠাভাজন হইতেছেন। তখন কেহ শারীরিক শ্রমসাধ্য জীবিকা অবলম্বন করিয়াছেন বলিয়া মানসিক শ্রমজীবীর নিকট উপেক্ষিত বা নগণ্য বিবেচিত হইবেন না। কর্ম্মক্ষেত্রে লোকে যে কোন শ্রমদ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করুন না কেন, তিনি গুণী ও সচ্চরিত্র হইলে সমাজে সমাদর পাইবেন। সকলে আপন আপন অবস্থাগত শ্রেণীর মধ্যে অবাধে মিশিতে পারিবেন। অবসরকালে সাহিত্য, রাজনীতি ও ধর্ম্ম আলোচনার সমান অধিকার পাইবে।

শিক্ষিত চরিত্রবান লোক যে ব্যবসায় গ্রহণ করুন না কেন, তাহাতে মানের হানি হইবে না অধিকন্তু তাঁহাদের সংস্রব হেতু সে ব্যবসায়ের মূল্য ও মর্য্যাদা বৃদ্ধি হইবে। শিক্ষিত লোক এই সকল শ্রমসাধ্য কর্ম্মদ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করিতে ইচ্ছুক হইলে রাজার সাহায্য প্রথমে আবশ্যক। রাজা যাহাদিগকে অনুগ্রহ করেন লোকে তাহাদিগকে সম্মান করে, রাজার অনুগ্রহ এতই মূল্যবান। আমাদের সৌভাগ্য যে সদাশয় উদার গভর্ণমেণ্ট এই সকল বিষয়ে অনুগ্রহ প্রদর্শন করিতেছেন।

জীবিকা অর্জ্জনের জন্য কোন বিশেষ বিদ্যা বা শিল্প শিখিতে হইলেও প্রথমতঃ সাধারণ শিক্ষা আবশ্যক। লিখন, পঠন ও অঙ্কে জ্ঞান যেমন সকলেরই আবশ্যক, সেইরূপ বিদ্যা বা শিল্পের গুরুত্ব

অনুসারে পূর্ব্ব শিক্ষা ও সংস্কার তদনুরূপ হওয়া আবশ্যক। প্রাচীন-কালে চিকিৎসা বা অন্য শাস্ত্র শিখিবার পূর্ব্বে ব্যাকরণ ও সাধারণ সাহিত্য অধ্যয়ন করিতে হইত। এবং অধুনাতন সময়ে ব্যবহার, চিকিৎসা পূর্ত্ত বা স্থাপত্য বিদ্যা পাঠ করিবার পূর্ব্বে ছাত্রবৃত্তি, প্রবেশিকা, এল-এ বা বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া আবশ্যক। এবম্বিধ নিয়মগুলি প্রাগুক্ত নীতির অনুসৃতি মাত্র।

এইজন্য প্রাথমিক শিক্ষা একান্ত আবশ্যক। ইহাতে হৃদয় মন উন্নত হয়। হৃদয় ও মন উন্নত না হইলে কোন ব্যবসায়ই সন্তোষ-জনকরূপে নির্ব্বাহ করা যায় না। প্রথমে সাধারণ ভাবে শিক্ষালব্ধ জ্ঞান লইয়া কোন ব্যবসায়িক বিদ্যা আলোচনা করিতে গেলে পূর্ব্বোক্ত জ্ঞান বহুল পরিমাণে শেষোক্ত বিদ্যালাভের সহায়তা করে। পূর্ব্বে সাধারণ শিক্ষা সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা হইতে বৃত্তি শিক্ষার জন্য সাধারণ জ্ঞানের নিদর্শন স্বরূপ বিশেষ বিশেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার নিয়ম থাকার কারণ স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে।

ভবিষ্য জীবনে ব্যবসায়ের অনুরোধে কেহ চিকিৎসক, ইঞ্জিনিয়ার, ব্যবহারজীবী, বণিক, কৃষক, শিল্পী বা শ্রমজীবী হইতে পারে, কিন্তু জীবনের সকল অবস্থাতেই প্রাগুক্ত সাধারণ শিক্ষালব্ধ বিদ্যার ক্রমোৎকর্ষ দ্বারা মানসিক পুষ্টিসাধন করা উচিত। মনের বৃত্তি সমূহের সম্যক ও সমঞ্জসীভূত বিকাশের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া চলিলে এবং সে জন্য চেষ্টা করিলে, মনের অনেক অভাব ও অন্ধকার দূর হইবে। মানসিক শিক্ষাজনিত বিকাশ ও স্ফূর্ত্তিতে মন এক দিকে কুসুম হইতেও কোমল হয়, অপর দিকে কুলিশ হইতেও কঠিন হয়। এই কোমলে কঠিন ও কঠিনে কোমল ভাব সকলের পক্ষেই বাঞ্ছনীয়।

এক্ষণে বৃত্তি শিক্ষা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, তাহারই পুনরুল্লেখ করিয়া এই মানসিক বিকাশের অধ্যায় শেষ করিতেছি।

পঠদ্দশা জীবনের উদ্যোগপর্ব্ব। প্রথমে বিদ্যালয়ে সাধারণ শিক্ষায় বিদ্যার্জ্জন ইহার প্রথম অবস্থা, তৎপরে বয়োবৃদ্ধিসহকারে সাধারণ শিক্ষার পরে জীবিকা অর্জ্জনের জন্য কোন একটা ব্যবসায়িক বিদ্যা শিক্ষা করা তাহার শেষ অবস্থা। এইরূপে সসজ্জ হইয়া কঠোর কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হয়। এই সেই বিষম পরীক্ষা স্থল, যেখানে মানুষের প্রকৃত মনুষ্যত্ব আছে কিনা জানা যায়; এই সেই সময়, যাহার জন্য এত উদ্যোগ, এত আয়োজন। কে কোন্ কর্ম্মের উপযুক্ত, কাহার কোন্ কর্ম্মে সুবিধা সুযোগ বেশী, এ সকল পূর্ব্বে বিচার করিয়া লইতে হইবে। সংসারে সকলেই এক কর্ম্ম করিবার জন্য আসে নাই। সমাজের বিভিন্ন বিভাগ আছে, প্রত্যেক বিভাগের জন্যই লোকের প্রয়োজন, বর্ত্তমান সময়ে সমাজের সকল বিভাগে উপযুক্ত লোক সমান সংখ্যায় পাওয়া যায় না। মনুষ্য-সমাজ সুশৃঙ্খলার সহিত চালাইতে হইলে সমাজের প্রত্যেকেরই দেখা উচিত যে, সকল বিভাগে প্রয়োজনানুরূপ উপযুক্ত লোক আছে কি না। এখন ইহার বিপরীত রীতিতে কার্য্য করা হইতেছে বলিয়া বিভাগবিশেষে উপযুক্ত লোকের অভাব ও বিভাগবিশেষে জনতা হইয়াছে। বহু জনাকীর্ণ স্থান হইতে লোক সংগ্রহ করিয়া প্রশস্ত ক্ষেত্রে উপনিবেশ স্থাপন করা যেমন সুনীতিসঙ্গত, সেইরূপ সমাজের যে বিভাগে উপযুক্ত লোকের জনতা হয়, তাহা হইতে তাঁহাদিগের অন্যত্র, যেখানে উপযুক্ত লোকের অভাব, সেইদিকে যাওয়া উচিত। সকলেরই ইংরাজী শিখিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী হইয়া রাজকর্ম্ম প্রাপ্তির জন্য চেষ্টা করিতে হইবে এমন নহে, অথবা দেশটা উকীলে পূর্ণ হইবে এমনও নহে। মানসিক শ্রমদ্বারা অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারিলে ভালই, কিন্তু যেখানে শারীরিক ও মানসিক উভয় বল প্রয়োগে অধিক উপার্জ্জন হয়, তাহা কৃত্রিম, লজ্জায় বা নিন্দার ভয়ে ত্যাগ করা উচিত নহে। দেশে, কৃষি

শিল্প ও বাণিজ্য নিরক্ষর লোকের হাতে রহিয়াছে। উপযুক্ত শিক্ষালাভ করিয়া উপযুক্ত লোকে ঐ সকল কার্য্য গ্রহণ করিলে সেই সেই কার্য্যের প্রভূত উন্নতি হয়। তদ্দ্বারা সমাজের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে উপকার হয়। তখন শিক্ষাবিস্তারের সহিত কৃষকবালক বিদ্যা অর্জ্জন করিবে, অবসরকালে সাহিত্য বিজ্ঞান ও ধর্ম্ম চর্চ্চা করিয়া মনুষ্যজীবনের সদ্ব্যবহার করিবে ও ভগবানকে ধন্যবাদ দিবে, কিন্তু এখনকার মত সে উপযুক্ত না হইয়াও কেবল কিছু লেখা পড়া বা ইংরাজী ভাষা কিছু শিখিয়াছে বলিয়াই পৈত্রিক বৃত্তি অনুপযুক্ত বিবেচনায় ত্যাগ করিয়া রাজদ্বারে বা ধর্ম্মাধিকরণে, কর্ম্মপ্রার্থীর বা উকীল মোক্তারের সংখ্যা বৃদ্ধি করিবে না এবং পরে প্রত্যাখ্যাত কিংবা নিরাশ হইয়া সমাজদ্রোহী হইবে না।

মানসিক উৎকর্ষে, লেখা পড়া শিক্ষায়, যদি লোককে শারীরিক শ্রমবিমুখ করে, বৃথা মান ও অহঙ্কার আনিয়া দেয় এবং তদ্দ্বারা জীবিকা অর্জ্জনের ক্ষেত্র সংকীর্ণ ও অপ্রশস্ত করে, তবে সে শিক্ষায় ফল কি? শারীরিক স্বাস্থ্য ও বিকাশ বল, আর মানসিক বিকাশ ও শিক্ষা, যাহাই বল, সকলেরই উদ্দেশ্য মনুষ্যত্ব লাভ করা। এই উদ্দেশ্যের প্রতি সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখিতে হইবে। আদর্শপূর্ণ মানবত্ব সকলেরই জীবনের লক্ষ্য হউক—এ সংসারসমুদ্রে ধ্রুবতারা হউক।

মানুষকে শরীর মন ও আত্মার সামবায়িক ও সমঞ্জসীভূত উৎকর্ষ এবং বিকাশ দ্বারা মানুষ হইতে হইবে ইহা যেন সর্ব্বদা মনে থাকে।

অতঃপর নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের কথা বলিতেছি।

আধ্যাত্মিক ও নৈতিক কল্যাণের কথা।

রেলওয়ে, ষ্টীমার, পোষ্ট ও টেলিগ্রাফের সাহায্যে পৃথিবীর অতি দূর, দুর্গমস্থানও নিকট হইতে নিকটতর হইতেছে। লোকে লোকের সহিত নানা কর্ম্মোপলক্ষে পরস্পরের সংস্রবে আসিতেছে। আমরণ কাল পরস্পরের চাক্ষুষ পরিচয় না থাকিলেও, পত্রাদিতে এত পরিচয় হয় যে, তাহাতে যথেষ্ট বন্ধুতা জন্মে। এইরূপে নানা প্রকারে বিভিন্ন প্রকৃতি ও ধর্ম্মের লোকের সংস্রবে আসিয়া, লোকের মধ্যে একটী উদার ভাব আসিতেছে। এখন, লোকে, অন্যের ধর্ম্মের নিন্দা করেন না, ম্লেচ্ছ বলিয়া স্পর্শ হেতু পাতিত্যের ভয়ে, হিন্দু দূরে পলায়ন করেন না; মুসলমান কাফেরের নিন্দা করেন না, অথবা খ্রীষ্টান তাঁহার সম্প্রদায়ের বাহিরের লোককে কুসংস্কারাপন্ন পৌত্তলিক "হীদেন" বলিয়া ঘৃণা করেন না। এই উদার বিশ্বজনীন প্রেমধর্ম্মের দিনে একটী যেন সাধারণ স্বার্থে সকলেই সংসৃষ্ট। সেই জন্য জাতি, বর্ণ, ধর্ম্ম ও দেশগত পার্থক্য ভুলিয়া এত উদার ও সহৃদয় ভাবে আমরা মিশিতে শিখিতেছি। কেশবের তিরোধানে, বিদ্যাসাগর বা রাজেন্দ্রলালের অভাবে, কৃষ্ণদাস বা কাশীনাথের * মৃত্যুতে জগতের সভ্যসমাজ শোক প্রকাশ করিয়াছেন। টিণ্ডেল, হাক্সলী, পাস্তুরের মৃত্যুতে পৃথিবীর সুধীসমাজ ও বৈজ্ঞানিকগণ, শোকসন্তপ্ত হইয়াছেন। আমরা এখন মহামতি গ্ল্যাডষ্টোনের জন্মতিথিতে তাহার আরও দীর্ঘ জীবন কামনা করি, প্রেসিডেন্ট গারফিল্‌ডের অপমৃত্যুতে শোক প্রকাশ করি, রুশিয়ার জারের বিপন্মুক্তিতে আনন্দ প্রকাশ করি। এই সকল দেখিয়া

---

* প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ৺কাশীনাথ ত্র্যম্বক তেলাঙ্গ বোম্বাই হাইকোর্টের জজ।

বেশ বোধ হইতেছে যে, জগতে একটী বিশ্বজনীন প্রেমের ভাব আসিতেছে। প্রকৃত পক্ষেই লোকের উদারতাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, বসুধায় কুটুম্বিতা বৃদ্ধি পাইতেছে। এখন এক ধর্ম্মের ভক্ত নিষ্ঠাবান ভদ্রলোককে, অপর ধর্ম্মের লোকেরা তাঁহার অনুষ্ঠিত ধর্ম্ম সম্বন্ধে ভিন্ন মত পোষণ করিয়াও তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি প্রকাশ করিতে ও তাঁহার প্রশংসা করিতে শিখিয়াছেন। এইটুকু বর্ত্তমান সভ্যতার প্রধান চিহ্ন।

ধর্ম্মে ও নীতিতে এমন কতকগুলি সাধারণ বিষয় আমরা পাইয়াছি, যাহা, জগতের আমরা, সকলেই প্রশংসা করি, শ্রদ্ধা করি, ভক্তি করি ও আত্মজীবনে পালন করিতে প্রয়াস পাই। আত্মধর্ম্মে নিষ্ঠা, পরধর্ম্মে শ্রদ্ধা, চরিত্রে কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, ন্যায়পরতা, সরলতা, সত্যপ্রিয়তা, ঔদার্য্য, সাহস ও সহিষ্ণুতা ; হৃদয়ে কোমলতা, প্রেমপ্রবণতা কোথায় কে না প্রশংসা করেন ও আত্মজীবনে প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা না করেন ?

নীরস নীতির অনুসরণ করিলে জীবন সরস হয় না। জীবনে ধর্ম্ম চাই, ধর্ম্মে বিশ্বাস ও ভক্তি চাই। ধর্ম্মজীবন পাইবার জন্য ইচ্ছা চাই, প্রয়াস চাই, এবং এ সকলে নিষ্ঠা চাই। কোন্ ধর্ম্ম ভাল কোন্ ধর্ম্ম মন্দ, তাহার বিচার করিবার এ স্থান নহে। অধিকন্তু এখানি ধর্ম্ম বা দর্শন গ্রন্থ নহে। এইরূপ ক্ষুদ্র পুস্তকে ঐ সকল কথার সবিস্তার বিচার ও বর্ণনা করা সম্ভবপর নহে—বাঞ্ছনীয়ও নহে। এখানে যাহা বলিব তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি—পুনরুক্তি দোষ সত্ত্বেও আবার একবার বলি। ধর্ম্মে ও নীতিতে আমরা এমন কতকগুলি সাধারণ বিষয় পাইয়াছি, যাহা, জগতের আমরা, সকলেই প্রশংসা করি, শ্রদ্ধা করি, আত্মজীবনে পালন করিতে ইচ্ছা ও প্রয়াস পাই। সেই গুলির কথা এইস্থানে বলিব। সেই নিরপেক্ষ ধর্ম্মনীতি গুলি সকলেই সমান ভাবে গ্রহণ করিতে পারিব এবং তাহা আত্মজীবনে আচরণ করিলে আত্মার কল্যাণ

হইবে। সে গুলি সকল ধর্ম্মাবলম্বীর পক্ষে সমানভাবে উপকারী ও ধর্ম্মজীবনলাভের সহায় বলিয়া বিবেচিত হয়।

লোকে যদি আপন ধর্ম্ম (অর্থাৎ জ্ঞান, বিশ্বাস ও ভক্তি সহকারে যে ধর্ম্মকে সত্য বলিয়া জানে) নিষ্ঠার সহিত পালন করে, তবে সাম্প্রদায়িক ঈর্ষ্যার ভাব থাকে না, জীবন সুখী ও সরস হয় এবং দিনে দিনে অনন্ত উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতে পারে। বর্ত্তমান সময়ে সর্ব্ব কর্ম্মে নিষ্ঠার অভাব হইয়াছে। অসরলতা ও অনাচার হেতু এত গোলযোগ হইতেছে। এই জন্য সকল ধর্ম্মের ভিত্তিভূমি, সকল ধর্ম্ম কর্ম্মের রক্ষক ও পোষক নিষ্ঠার কথা বলিতেছি। নিষ্ঠার একটা নৈয়ায়িক সংজ্ঞা দিয়া নিষ্ঠা কি বুঝাইবার আবশ্যক দেখি না।

নিষ্ঠা।

নিয়মের অনুবর্ত্তিতাই নিষ্ঠা। কোষে, নিষ্ঠা অর্থে "নিশ্চয়রূপে থাকা" কথিত হইয়াছে। প্রকৃত পক্ষে তাহাই। যে সমাজে থাকা যায়, যে ধর্ম্মে বিশ্বাস করা যায়, তাহাতে নিশ্চয় ভাবে, সত্য ভাবে, থাকিতে হইলে তাহার নিয়মের অনুবর্ত্তন করাই নিষ্ঠা। সেই সকল নিয়ম পালন না করিলেই স্বেচ্ছাচার হইল—এই স্বেচ্ছাচার সর্ব্বথা নিন্দনীয়। বিশ্বনিয়ন্তার এ রাজ্যে, নিয়মেরই প্রাধান্য ও রাজত্ব—ইহা নিয়মতন্ত্র। তাঁহার নিয়মে, প্রকৃতিতে কেমন সুন্দর কাজ চলিতেছে। কেহ কাহারও স্বেচ্ছামত কাজ করে না। ভ্রাম্যমাণ জ্যোতিষ্ক মণ্ডল আপন আপন কক্ষেই ভ্রমণ করিতেছে। সমীরণ জীবের অশেষ কল্যাণের জন্য সতত সঞ্চরমাণ। নির্দ্দিষ্ট সময়ে সূর্য্য কিরণ দিতেছে—চন্দ্রমা জ্যোৎস্না ঢালিতেছে। উষা, সূর্য্যের আগমন-বার্ত্তা এবং প্রদোষ তাহার অস্ত গমনের কথা যথা সময়ে পৃথিবীর নিকট ঘোষণা করিয়া আসিতেছে। ভৃত্যের ন্যায় আজ্ঞা পালন করিয়াই তাহারা কৃতার্থন্মন্য হইতেছে। মানবের মধ্যে ভগবান যে কাজ টুকু তাহার হাতে দেন

নাই সে টুকু ঠিক চলিতেছে। কিন্তু যে বিষয়ে স্বাধীনতা দিয়াছেন সেই খানেই তাহার অপব্যবহার দেখি। স্বাধীনতার নামে স্বেচ্ছাচার হইতেছে। এই নিয়ম তন্ত্রের মধ্যে—কি অন্তর্জগতে আর কি বাহ্ প্রকৃতিতে—সর্ব্বত্রই স্বেচ্ছাচার নিন্দনীয়। এখানে স্বেচ্ছাচারের স্থান নাই; স্বেচ্ছাচারী শীঘ্র হউক আর গৌণে হউক, দণ্ডিত হয়।

আপন আপন নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিতে হইবে। কোথাও বা আজ্ঞাপ্রাপ্ত কর্ম্মে কোথাও বা যুক্তিবিচারে, সদ্বুদ্ধিতে, স্থিরীকৃত কর্ম্মে নিষ্ঠার সহিত রত থাকিতে হইবে। নিষ্ঠা ত্যাগ করিয়া উচ্ছৃঙ্খল হইয়া কোথাও তিষ্ঠান যায় না। শীঘ্র হউক আর বিলম্বেই হউক ধ্বংস আসিয়া স্বেচ্ছাচারীকে গ্রাস করে। নিষ্ঠা ধর্ম্মকে রক্ষা করে, ধর্ম্ম সকলকে রক্ষা করে।

নিষ্ঠা চায় যে, কেহ কপট না হয়, স্বেচ্ছাচারী না হয়। নিষ্ঠা চায় যে, সমাজের হউক, ধর্ম্মের হউক, রাজ্যের হউক, যেখানে যে নিয়ম আছে কেহ তাহার উল্লঙ্ঘন না করে। সকল সমাজেই, সকল ধর্ম্মেই লোকে কপট, বিটল ও ভণ্ডদিগকে নিন্দা ও ঘৃণা করে। নিষ্ঠা কপটাচার চায় না। অন্যের চক্ষে কাহারও ধর্ম্ম, কাহারও সমাজ কুসংস্কার পূর্ণ হইতে পারে; কিন্তু নিষ্ঠার চক্ষে সকলই সমান। মহামতি গ্ল্যাডষ্টোন নিষ্ঠাবান খ্রীষ্টান, বৈজ্ঞানিক সুপণ্ডিত কাদার লাফোঁ নিষ্ঠাবান খ্রীষ্টান, মাননীয় জজ শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় নিষ্ঠাবান হিন্দু। হিন্দুধর্ম্ম ও খ্রীষ্টানধর্ম্ম প্রকৃতিগত ভিন্ন হইলেও নিষ্ঠার হিসাবে প্রাগুক্ত মহাত্মারা সকলেই প্রশংসনীয়। অতএব জ্ঞানী হও আর অজ্ঞ হও, যতদিন কোন ধর্ম্ম বা সমাজভুক্ত থাকিবে, ততদিন সরল চিত্তে নিষ্ঠার সহিত সেই ধর্ম্মের ও সমাজের নিয়ম পালন করিবে।

এই জগৎ নিত্য পরিবর্ত্তনশীল। পরিবর্ত্তনশীলতা প্রায় সকল স্থলেই সজীবতা ও উন্নতিশীলতার পরিচায়ক। প্রত্যেক সাত বৎসরে

মানবদেহে সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হয়। অতএব মনের বা ধর্ম্ম মতের যে কোন পরিবর্ত্তন হইবে না, এরূপ আশা করা যায় না। কিন্তু তাহা বলিয়াই লোকের ধর্ম্মমত নিত্য পরিবর্ত্তিত হইতেছে এরূপ নহে। এসম্বন্ধে মানব প্রকৃতি এখনও তত চঞ্চল হয় নাই। যাহা হউক, ধর্ম্মমত পরিবর্ত্তনের পূর্ব্বে বিশেষ বিচার আবশ্যক। কিন্তু ধর্ম্মের উন্নতির জন্য আত্মার কল্যাণের জন্য এই কথাটি যেন মনে থাকে যে, যখন যে ধর্ম্মের আশ্রয়েই থাকা যাউক না কেন, অকপট ও সরল চিত্তে, একান্ত মন প্রাণে নিষ্ঠা ও ভক্তির সহিত তাহার সেবা করা কর্ত্তব্য। ইহাতেই আত্মার কল্যাণ হয়, এবং ধর্ম্মমত পরিবর্ত্তনেও আত্মার অধোগতি হয় না। অন্যথা, কৌতূহল পরবশ হইয়া, নাম ও যশের জন্য কিংবা সাংসারিক স্বার্থসাধনের জন্য, চঞ্চল চিত্তে যদি ধর্ম্মমত পরিবর্ত্তন করা যায়, ধর্ম্মের বেশ পরিধান করা যায়, তবে অচিরে ধ্বংস প্রাপ্তি হয়। অতএব যিনি যে ধর্ম্মাবলম্বী হউন না কেন, তিনি যেন স্বধর্ম্ম, নিষ্ঠা ও ভক্তির সহিত পালন করেন। ধর্ম্মও তাঁহাকে পালন করিবে।

ধর্ম্ম জীবন গঠনের জন্য, আত্মার কল্যাণের জন্য, সাধারণ ভাবে আর একটী বিষয়ের কথা বলিতে পারা যায়। সেটি পবিত্র বিষয়ে শ্রদ্ধা ও ভক্তির ভাব। ধর্ম্ম-বিদ্বেষের ভাব ক্রমে চলিয়া যাইতেছে। এখন আর ধর্ম্মযুদ্ধ হয় না।

শ্রদ্ধা ও ভক্তি।

প্রোটেষ্টাণ্ট ক্যাথলিকের নিগ্রহ করে না; খ্রীষ্টান য়িহুদীকে যন্ত্রণা দেয় না। হিন্দুর দেবতা আর কাহার হাতে নিগৃহীত হয় না। কালাপাহাড়ের অত্যাচার অতীতের কথা হইয়াছে এবং এমন এক সময় আসিতেছে, যখন মহম্মদ ঘোরীর কালাপাহাড় বা ঔরঙ্গজেবের ধর্ম্মার্থে বিদ্বেষবহ্নিতে পরধর্ম্ম-ধ্বংস-প্রয়াস, লোকের কষ্ট কল্পনার বিষয় হইবে। ধর্ম্মান্ধতা, গোঁড়ামির দিন ক্রমেই চলিয়া যাইতেছে। রাজার সুশাসন

ও ভবিষ্যৎ নাই। ইহা নিত্যকালই বর্ত্তমান। এই জন্য যাহা সত্য তাহা নিত্য সত্য। এই মহিমান্বিত সত্য পালন করিয়া, সকলের কৃতার্থম্মন্য ও ধন্য হওয়া উচিত।

সত্য আচরণের তিনটি প্রকার ভেদ আছে। কায়, মনও বাক্যে সত্য আচরণ করিতে হইবে। অথবা সরল ভাষায় বলিতে হইলে সত্য —চিন্তাতে, সত্য—কার্য্যে, সত্য—কথায় আচরণ করা আবশ্যক।

সত্য চিন্তা:

আমরা লোকচক্ষুর অন্তরালে চিন্তা করি। এমন কোন ইন্দ্রিয় নাই যদ্দ্বারা অপরের মনোগত চিন্তা জানিতে পারা যায়। হৃদয়-নিভৃতে কাহার কত বিরুদ্ধ ভাব আছে, তাহা কে জানে? লোকচক্ষুর অন্তরালের চিন্তা, হৃদয়-নিভৃতের ভাব, যদ্দ্বারা সত্য শুদ্ধ ও পবিত্র হয়, তজ্জন্য সতত চেষ্টা করিতে হইবে। আমাদের কার্য্য ও কথা, চিন্তার অভিব্যক্তি বা বিকাশ মাত্র। কার্য্য ও কথায়, অগ্রজা চিন্তাকে, তাহাদের অনুরূপ করিতে হইবে, দেখিতে হইবে যে তাহাদের মধ্যে সামঞ্জস্য আছে—কেহ কাহারও বিরোধী না হয়।

আমরা সামাজিক জীব। ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর নাড়ী বন্ধন ছিন্ন হইলে আরও শত বন্ধনে আমরা আবদ্ধ হই। সেই হইতে, লোকের সহিত নানা সম্বন্ধে সম্বদ্ধ। পুত্ররূপে, ভ্রাতৃরূপে, শিষ্যরূপে, বন্ধুরূপে, প্রজারূপে, প্রভুরূপে—আমাদের সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। প্রত্যেক সম্বন্ধ-জনিত একটি একটি ভাব আমরা হৃদয়ে পোষণ করি। এক এক জনের সম্বন্ধে এক এক প্রকার চিন্তা হয়। পুত্ররূপে, পিতামাতার প্রতি ভক্তি ভালবাসার ভাব পোষণ করি, ভ্রাতৃরূপে প্রীতির ভাব পোষণ করি, প্রজারূপে রাজার কল্যাণ কামনা করি। এইরূপে আমাদের ভাব ও চিন্তা সম্বন্ধের অনুযায়ী হইবে। কিন্তু দৃশ্যতঃ ঐ সকল সম্পর্ক সত্বে যদি আমরা মনে মনে বিরুদ্ধ ভাব পোষণ করি, অমঙ্গল চিন্তা

করি তবে আমরা চিন্তাতে সত্য আচরণ না করিয়া মিথ্যা আচরণ করিলাম। ইহা যদিও কেহ দেখিতে পায় না, তথাপি ইহা গর্হিত এবং বর্জ্জনীয়। এইপ্রকারে এবং আরও নানা প্রকারে, চিন্তাতে মিথ্যার ভাব আসে। মিথ্যা—অসত্য—সর্ব্বদা পরিহার করিতে হইবে। অতএব এইজন্য সতত সাবধান থাকিবে এবং আমাদের চিন্তা পর্য্যন্তও যাহাতে সত্য এবং পরবর্ত্তী কথা ও কার্য্যের অনুযায়ী হয় তজ্জন্য নিরন্তর চেষ্টাবান হওয়া আবশ্যক।

সত্যকথা।

নিসর্গ যাহাকে শোভনা করিয়াছে তাহার ভূষণের কি প্রয়োজন? যে স্বয়ং সুন্দরী, শিল্প দ্বারা তাহার শোভা সম্পাদন অনাবশ্যক। সেইরূপ, কথা যদি স্বভাবতঃ সত্য হয়, প্রকৃত হয়, তবে তাহার আর অলঙ্কার ও রসবিন্যাসের তাদৃশ প্রয়োজন হয় না। সত্যই কথার শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার। সত্য স্বপ্রকাশ ও জ্যোতিষ্মান্। চতুর্দ্দিকে যখন মিথ্যাবাগ্‌জালে প্রকৃত বিষয় ঘনতমসাবৃত ও অলক্ষিত থাকে, তখন সত্যকথা, দীপশিখার ন্যায় ক্ষুদ্র হইলেও চারিদিক উদ্ভাসিত করিয়া প্রকৃত তথ্য প্রকাশিত করে। সত্যকথার অশেষ শক্তি।

সত্যকথা কহিয়া মানব সত্যের মহিমা বৃদ্ধি করে না, নিজের জিহ্বা পবিত্র করে। সত্য অমৃত, সকলেরই তাহার আস্বাদন লইয়া রসনাকে তৃপ্ত করা উচিত।

জগতের যত ধর্ম্মশাস্ত্র আছে, পুরাণ ইতিসাস আছে, সকলেরই একান্ত প্রয়াস যে সত্য কথা প্রচার করে। সাহিত্য-ভাণ্ডারে, সত্যকথার উৎকর্ষ, মিথ্যাকথার অপকর্ষ প্রতিপাদন করিবার জন্য কত আখ্যায়িকা আছে। "কৃষ্ণদাস নামক রাখালের" কথা হইতে যুধিষ্ঠিরের "অশ্বত্থামা হতঃ ইতি গজঃ" পর্য্যন্ত, সকল শ্রেণীর লোকের জন্য কোন না কোন উপদেশ আছে। শ্রেণীপাঠ্য পুস্তকে,

মহৎ লোকের চরিত্রের আখ্যায়িকায়, পিতামহীর সায়াহ্ণ কথিত কাহিনীতে, সত্য মিথ্যার কত দ্বন্দের কথা শুনা যায়! বিজ্ঞান শাস্ত্রে, দর্শনশাস্ত্রেও ঐ কথা। বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক সকলেই বলিতে-ছেন যে, দেখ "আমি যাহা বলিতেছি তাহাই সত্য" সত্যকথার দোহাই সকলে দিতেছেন। সত্য সকলের আশ্রয় ভূমি।

পবিত্র রামায়ণে কথিত আছে যে, "সত্যবাক্যে ও সর্ব্বভূতে দয়াই সনাতন রাজধর্ম্ম; অতএব রাজ্যও সত্যে স্থাপিত, অধিক কি সমুদয় লোকও একমাত্র সত্যে প্রতিষ্ঠিত।"* লোকসমাজও সত্যে প্রতিষ্ঠিত। জনসমাজে থাকিতে হইলে, জনসাধারণের হিতের জন্য, আত্মপরের শ্রেয়ঃকল্পে, সমাজের শৃঙ্খলার জন্য সত্যকথার কতদূর আবশ্যক তাহা প্রতিপাদন করিতে এখানে দুই চারিটি কথার উত্থাপন করা আবশ্যক।

বিশ্বাসের উপর সমাজ স্থাপিত। বিশ্বাস সত্যের উপর স্থাপিত। অতএব সত্যই সকলের মূল। সত্যই এ সমাজসৌধের ভিত্তিভূমি। পূর্ব্বে সত্যের তিনটি অবস্থার কথা উক্ত হইয়াছে—সত্যচিন্তা, সত্যকথা, ও সত্যকার্য্য। আমরা, যেমন সকল সময়, অতীত ও ভবিষ্যৎকে প্রত্যক্ষ ভাবে গণনায় না আনিয়া, বর্ত্তমান লইয়া ব্যস্ত থাকি, সর্ব্ব কার্য্যে বর্ত্তমানের সহিত সম্পর্ক রাখিয়া বিচার করি, তদ্রূপ, আমরা সত্যকথা লইয়া অধিক সময় ব্যস্ত থাকি এবং পূর্ব্ববর্ত্তী চিন্তা ও পরবর্ত্তী কার্য্যের বিচার পরে করি।

এই সত্যকথার উপর নির্ভর করিয়া জনসমাজস্থ লোকসমূহ একত্র বাস করিতেছে। এই সত্যকথার উপর নির্ভর করিয়া লোকে ব্যবসায় বাণিজ্য করিতেছে। রাজা শিষ্টের পালন ও দুষ্টের দমন করিয়া থাকেন বলিয়াছেন, সেই জন্য প্রজাসাধারণ শিষ্ট হইয়া রাজানুগ্রহ

---

* বাল্মীকি রামায়ণ অযোধ্যা কাণ্ড ১০৯ম সর্গ।

পাইবার চেষ্টা করে। সেই হেতু, দুষ্ট গোপনে দুষ্ক্রিয়া করে। এ সকলের মূলে কি দেখা যায়? সত্যকথায় বিশ্বাস। অতএব দেখা যাইতেছে যে লোকসমাজ প্রত্যক্ষভাবে সত্যকথায় চলিতেছে; সত্য-কথায় বিশ্বাস আনয়ন করে; বিশ্বাসে সর্ব্বপ্রকার বিষয় কর্ম্ম চলিতেছে।

অনেকের ধারণা, সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে মিথ্যা ও প্রবঞ্চনা বৃদ্ধি পাইতেছে। একটু চিন্তার সহিত এ বিষয়টি বিচার করা আবশ্যক।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, এখন রেলওয়ে, ষ্টীমার, পোষ্ট আফিস ও টেলিগ্রাফ প্রভৃতির প্রচলন হেতু বসুধার সহিত কুটুম্বিতা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। যদি কুটুম্বিতা বৃদ্ধি পাইল তবে মিথ্যা ও প্রবঞ্চনা বৃদ্ধি পাইতেছে বলা সঙ্গত বোধ হয় না। কিন্তু তাহা নয়; মিথ্যা প্রবঞ্চনা পূর্ব্বে যেমন ছিল, এখন হয়ত তেমনই আছে। কোথাও বা অল্প বৃদ্ধি পাইয়া থাকিতে পারে, কিন্তু তদপেক্ষা, মিথ্যা ও প্রবঞ্চনার উপর আমাদের যে অত্যধিক ঘৃণা বৃদ্ধি হইয়াছে, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এবং এই নিমিত্তই আমরা কুত্রাপি সত্যের স্বল্পাধিক অপলাপ দেখিলে এত ক্রুদ্ধ হই। দুই একটি উদাহরণ দিলেই একথার যাথার্থ্য প্রমাণ হইবে। প্রথমে ডাকঘরের কার্য্য লওয়া যাউক।

কি স্বদেশে, কি প্রবাসে, আমাদিগকে সর্ব্বত্র নিত্যই ডাকঘরের সহিত সম্পর্ক রাখিতে হয়। ডাকপিয়াদা, নিজের বেতনভোগী ভৃত্য অপেক্ষাও, তৎপরতার সহিত পত্রাদি গৃহে দিয়া যায়। এক্ষণে দেখা যাউক, যদি কোন সহরে, যেখানে চিঠি তিন চারিবার বিলি হয়, এবং তত্রস্থ ডাক পিয়াদা, কোন ভদ্রলোকের তিনবারের তিনখানি পত্র অপরাহ্নে একবারে দিয়া যায়, এবং তজ্জন্য, মধ্যাহ্নের গাড়ীতে, কোন বিশেষ কর্ম্মোপলক্ষে তাঁহার স্থানবিশেষে যাওয়া না হয়, তবে, ব্যাপারটি কেমন গুরুতর হয় তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। ডাক বিভাগের

প্রধান কর্ম্মচারী হইতে ডাকপিয়াদা বেচারা পর্য্যন্ত সকলেই অভিযোগের জ্বালায় অস্থির হয়। এখন কথা এই যে কেন ভদ্রলোকটি দুই এক পয়সা পত্রের মাশুল দিয়া এত নিয়মমত কার্য্য পাইবার জন্য দাবী করেন, আশা করেন? ইহার কারণ আছে; কারণটি এই যে, ডাকবিভাগের কর্ম্মচারী, সেই বিভাগের পক্ষ হইতে বিজ্ঞাপন পত্রে স্বাক্ষর করিয়া সাধারণকে বলিয়াছেন যে অমুক অমুক সময়ে অমুক অমুক স্থানের পত্র বিলি হইবে এবং সে কথা অনুসারে সকলে নিত্য কাজ করেন, উপস্থিতক্ষেত্রে সে কথা অসত্য হইয়াছে, সেইজন্য ভদ্রলোকটির কার্য্যহানি হইয়াছে এবং তজ্জন্যই এত ঘৃণা ও এত অভিযোগ।

কিন্তু আবার যদি ঐ ভদ্রলোকটি তাঁহার নিজ গ্রামে যান এবং সেখানকার ডাকঘরের এমন বন্দোবস্ত থাকে যে সেই গ্রামে সপ্তাহে দুইবার মাত্র পত্র বিলি হয়, তবে তিনি তিনদিনের তিনখানি পত্র একত্র পাইয়াও অসন্তুষ্ট হইবেন না—কারণ সেখানকার ডাকঘরে নিত্য তিন বার পত্র বিলি করিবে বলিয়া বিজ্ঞাপন প্রচার করা হয় নাই। এবং এক দিনে তিন দিনের চিঠি বিলি করাতে তথায় কোন অসত্য কার্য্য হয় নাই।

এই রূপে রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ বিভাগের কার্য্যাদিতে অযথা বিলম্ব হইলে আমরা অত্যন্ত বিরক্ত হই, ঘৃণা প্রকাশ করি। কিন্তু, আবার আমরাই, যদি নৌকাযোগে কোথাও যাই অথবা লোক দ্বারা দূরান্তরে সংবাদ পাঠাই এবং তাহাতে এক ঘণ্টার স্থলে দশ ঘণ্টা বিলম্ব হয় তবে সেস্থলে বড় কিছু বলি না। অতএব দেখা যাইতেছে বিলম্বই এইরূপ ঘৃণার কারণ নহে—কিন্তু বিজ্ঞাপিত কথার ব্যতিক্রমে অথবা সত্যের অপলাপে ঘৃণার উদ্রেক হয়।

সভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সত্যানুরাগ ও সত্যনিষ্ঠা বৃদ্ধি পাওয়া

উচিত। এবং প্রকৃতপক্ষে শিক্ষা বিস্তার ও দায়িত্ববোধের সহিত সত্যনিষ্ঠা বৃদ্ধি পাইতেছে। রেলওয়ে, পোষ্টআফিস, টেলিগ্রাফ প্রভৃতির বিস্তারের সহিত, অজ্ঞাতসারে, আমরা সত্যনিষ্ঠ হইতে বাধ্য হইয়েছি। বিশিষ্ট বণিক সম্প্রদায়, রাজকর্মচারিগণ এবং সাধারণ্য, সকলেই পরস্পর পরস্পরের জন্য সত্যনিষ্ঠ হইতে বাধ্য হইতেছেন। তবে একথা এস্থলে স্বীকার্য্য যে কোথাও কোথাও বিশ্বাসঘাতকতা, প্রবঞ্চনা মিথ্যা কথা দ্বারা সমূহ ক্ষতি হইতেছে; ইহা অবশ্যই পরি-তাপের বিষয়। কিন্তু সত্যের সহিত তুলনায় ইহার সংখ্যা অতি কম। অন্যথা জগতে ঘোর বিপ্লব উপস্থিত হইত। এখন যে, আমরা গাড়ী অসময়ে আসিলে, চিঠি নির্দ্দিষ্ট সময়ের পরে পাইলে, বিজ্ঞাপন মত কার্য্য না পাইলে, এত বিরক্তি ও ঘৃণা প্রকাশ করি. তাহার কারণ এই যে আমরা সর্ব্বত্র কথামত কার্য্য পাইতেছি, পাইবার জন্য আশা করিতে অভ্যস্ত হইয়াছি। সেইজন্য তাহার বিপরীত ব্যবহার দেখিলে ঘোরতর ঘৃণা প্রকাশ করি।

সাহিত্য, বিজ্ঞান ও ব্যবসায় বাণিজ্য প্রভৃতি নানাকারণে সমগ্র সভ্যজগতের লোক যেন একটি বিশাল সমাজবন্ধনে বদ্ধ হইতেছেন। এই সুবিশাল ভদ্র সমাজের আমরাও এক এক জন। যদি সভ্যতার ও শিক্ষার অভিমান হৃদয়ে পোষণ করি, যদি ভদ্র বলিয়া পরিচয় দিয়া গৌরবান্বিত হইতে ইচ্ছুক হই, তবে ভদ্র সমাজের প্রথম নিয়ম সত্যবাদিতা সর্ব্বতোভাবে পালন করিতে হইবে। প্রত্যেক ভদ্রলোকই সত্যকথা বলিবার জন্য দায়ী। এই দায়িত্ব সম্যকরূপে উপলব্ধি করিতে হইবে। কেবল ভদ্রবংশে জন্ম ও ভদ্রজনোচিত বেশভূষা করিলেই ভদ্র হয় না। বর্ত্তমান যুগের একজন শ্রেষ্ঠতম রাজনীতিজ্ঞ—অশীতিপর বৃদ্ধ মহামতি গ্লাডষ্টোন সাহেব বলেন যে "যিনি সত্য কথা বলেন তিনিই ভদ্রলোক।" বাস্তবিকই 'ভদ্র' কথাটীর ইহা অপেক্ষা

প্রধান কর্ম্মচারী হইতে ডাকপিয়াদা বেচারা পর্য্যন্ত সকলেই অভি-যোগের জ্বালায় অস্থির হয়। এখন কথা এই যে কেন ভদ্রলোকটি দুই এক পয়সা পত্রের মাশুল দিয়া এত নিয়মমত কার্য্য পাইবার জন্য দাবী করেন, আশা করেন? ইহার কারণ আছে; কারণটি এই যে, ডাকবিভাগের কর্ম্মচারী, সেই বিভাগের পক্ষ হইতে বিজ্ঞাপন পত্রে স্বাক্ষর করিয়া সাধারণকে বলিয়াছেন যে অমুক অমুক সময়ে অমুক অমুক স্থানের পত্র বিলি হইবে এবং সে কথা অনুসারে সকলে নিত্য কাজ করেন, উপস্থিতক্ষেত্রে সে কথা অসত্য হইয়াছে, সেইজন্য ভদ্র-লোকটির কার্য্যহানি হইয়াছে এবং তজ্জন্যই এত ঘৃণা ও এত অভিযোগ।

কিন্তু আবার যদি ঐ ভদ্রলোকটি তাঁহার নিজ গ্রামে যান এবং সেখানকার ডাকঘরের এমন বন্দোবস্ত থাকে যে সেই গ্রামে সপ্তাহে দুইবার মাত্র পত্র বিলি হয়, তবে তিনি তিনদিনেব তিনখানি পত্র একত্র পাইয়াও অসন্তুষ্ট হইবেন না—কারণ সেখানকার ডাকঘরে নিত্য তিন বার পত্র বিলি করিবে বলিয়া বিজ্ঞাপন প্রচার করা হয় নাই। এবং এক দিনে তিন দিনের চিঠি বিলি করাতে তথায় কোন অসত্য কার্য্য হয় নাই।

এই রূপে রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ বিভাগের কার্য্যাদিতে অযথা বিলম্ব হইলে আমরা অত্যন্ত বিরক্ত হই, ঘৃণা প্রকাশ করি। কিন্তু, আবার আমরাই, যদি নৌকাযোগে কোথাও যাই অথবা লোক দ্বারা দূরান্তরে সংবাদ পাঠাই এবং তাহাতে এক ঘণ্টার স্থলে দশ ঘণ্টা বিলম্ব হয় তবে সেস্থলে বড় কিছু বলি না। অতএব দেখা যাইতেছে বিলম্বই এইরূপ ঘৃণার কারণ নহে—কিন্তু বিজ্ঞাপিত কথার ব্যতিক্রমে অথবা সত্যের অপলাপে ঘৃণার উদ্রেক হয়।

সভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সত্যানুরাগ ও সত্যনিষ্ঠা বৃদ্ধি পাওয়া

উচিত। এবং প্রকৃতপক্ষে শিক্ষা বিস্তার ও দায়িত্ববোধের সহিত সত্যনিষ্ঠা বৃদ্ধি পাইতেছে। রেলওয়ে, পোষ্টআফিস, টেলিগ্রাফ প্রভৃতির বিস্তারের সহিত, অজ্ঞাতসারে, আমরা সত্যনিষ্ঠ হইতে বাধ্য হইতেছি। বিশিষ্ট বণিক সম্প্রদায়, রাজকর্ম্মচারিগণ এবং সাধারণ্য, সকলেই পরস্পর পরস্পারের জন্য সত্যনিষ্ঠ হইতে বাধ্য হইতেছেন। তবে একথা এস্থলে স্বীকার্য্য যে কোথাও কোথাও বিশ্বাসঘাতকতা, প্রবঞ্চনা মিথ্যা কথা দ্বারা সমূহ ক্ষতি হইতেছে; ইহা অবশ্যই পরি-তাপের বিষয়। কিন্তু সত্যের সহিত তুলনায় ইহার সংখ্যা অতি কম। অন্যথা জগতে ঘোর বিপ্লব উপস্থিত হইত। এখন যে, আমরা গাড়ী অসময়ে আসিলে, চিঠি নির্দ্দিষ্ট সময়ের পরে পাইলে, বিজ্ঞাপন মত কার্য্য না পাইলে, এত বিরক্তি ও ঘৃণা প্রকাশ করি তাহার কারণ এই যে আমরা সর্ব্বত্র কথামত কার্য্য পাইতেছি, পাইবার জন্য আশা করিতে অভ্যস্ত হইয়াছি। সেইজন্য তাহার বিপরীত ব্যবহার দেখিলে ঘোরতর ঘৃণা প্রকাশ করি।

সাহিত্য, বিজ্ঞান ও ব্যবসায় বাণিজ্য প্রভৃতি নানাকারণে সমগ্র সভ্যজগতের লোক যেন একটি বিশাল সমাজবন্ধনে বদ্ধ হইতেছেন। এই সুবিশাল ভদ্র সমাজের আমরাও এক এক জন। যদি সভ্যতার ও শিক্ষার অভিমান হৃদয়ে পোষণ করি, যদি ভদ্র বলিয়া পরিচয় দিয়া গৌরবান্বিত হইতে ইচ্ছুক হই, তবে ভদ্র সমাজের প্রথম নিয়ম সত্যবাদিতা সর্ব্বতোভাবে পালন করিতে হইবে। প্রত্যেক ভদ্রলোকই সত্যকথা বলিবার জন্য দায়ী। এই দায়িত্ব সম্যকরূপে উপলব্ধি করিতে হইবে। কেবল ভদ্রবংশে জন্ম ও ভদ্রজনোচিত বেশভূষা করিলেই ভদ্র হয় না। বর্ত্তমান যুগের একজন শ্রেষ্ঠতম রাজনীতিজ্ঞ—অশীতিপর বৃদ্ধ মহামতি গ্লাডষ্টোন সাহেব বলেন যে "যিনি সত্য কথা বলেন তিনিই ভদ্রলোক।" বাস্তবিকই 'ভদ্র' কথাটীর ইহা অপেক্ষা

সুন্দর সংজ্ঞা আর কি হইতে পারে? সত্যের উপর বিশ্বাস স্থাপিত, বিশ্বাসের উপর লোকসমাজ প্রতিষ্ঠিত। অতএব সকলের মূলভিত্তি, সত্যেতে নিষ্ঠাবান থাকিলে সকলই সুশৃঙ্খল হইবে এবং শৃঙ্খলাহেতু লোকসমাজ উন্নতির দিকে ধাবিত হইবে।

চিন্তার সত্যাসত্য যেমন প্রায় স্থলেই কথা ও কার্য্যে প্রকাশ ও পরীক্ষিত হয়, কথার সত্যাসত্য আবার তেমনই কার্য্যের উপর নির্ভর করে। কেবল, যে সকল কথা, দৃষ্ট বা শ্রুত ঘটনার যথাবিবৃতির উপর নির্ভর করে, সেইগুলি মাত্র তাহাদের পরবর্ত্তী কার্য্যের উপর নির্ভর করে না। অন্যথা অন্যান্য স্থলে, আমাদের কথাব যাথার্থ্য তাহার পরবর্ত্তী কার্য্যের উপর নির্ভর করে। দুইটি উদাহরণ দিয়া এই বিষয়টি বিচার করিলেই স্পষ্ট বুঝা যাইবে। রাম তাহার পিতাব ঘড়ীটি ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে। শ্যাম তাহা দেখিয়াছে। পিতা, যখন শ্যামকে জিজ্ঞাসা করেন যে, ঘড়ী কে ও কিরূপে ভাঙ্গিল, তখন শ্যাম যাহা দেখিয়াছে তাহা ঠিক করিয়া বলিলেই শ্যামের সত্যকথা বলা হইল। এই কথাটির যাথার্থ্য দৃষ্ট ঘটনার যথাবিবৃতির উপর নির্ভর করে—একথার পরবর্ত্তী কার্য্যের উপর নির্ভর করে না। শ্রুত ঘটনার সম্বন্ধেও সেইরূপ। কিন্তু অন্যত্র কথার যাথার্থ্য তাহার পরবর্ত্তী কার্য্যের উপর নির্ভর করে। শিক্ষক মহাশয় একদিন তিন পৃষ্ঠা ইতিহাস মুখস্থ করিবার জন্য পাঠ নির্দ্দেশ করিলেন। ছাত্রেরা অভ্যাস করিবে বলিল। কিন্তু নির্দ্দিষ্ট দিনে কেহ পাঠ মুখস্থ করিয়া না আসাতে তাহারা মিথ্যা আচরণ করিল। তাহাদের কথা পরবর্ত্তী কার্য্য দ্বারা মিথ্যা হইল।

সত্য কর্ম্ম।

বাক্যের সত্যতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে কথিত কার্য্য বাক্যের অনুযায়ী হওয়া আবশ্যক। বর্ত্তমান সময়ে আমরা নানাপ্রকারে কথা বলি।

মুখে, পত্রে, তারে, পুস্তকে ও বিজ্ঞাপন ইত্যাদিতে সাধারণের সহিত কথাবার্ত্তা চলিতেছে। পৃথিবীর এক প্রান্তের লোক অপর প্রান্তের লোকের সহিত ব্যবসায় বাণিজ্য করিতেছেন। এক্ষণে আমরা সংবাদপত্রে মার্কিণ ব্যবসায়ীর বিজ্ঞাপন দৃষ্টে বাঙ্গালা হইতে পণ্য পাঠাইতে অনুরোধ করি। ঠিক বিজ্ঞাপন বর্ণিত দ্রব্য যে পাইব—তাহার ভরসা কেবল, বণিকের কথায়। এখন যদি কার্য্যে বণিক অন্যথা করেন, তবে, প্রবঞ্চনা করা হইবে ও মিথ্যা কথা বলা হইবে। এরূপ করিলে ব্যবসা বাণিজ্য সকলই বিশৃঙ্খল হয়। অতএব যাঁহারা সাধারণের বিজ্ঞপ্তির জন্য কথা প্রচার করেন, তাঁহাদের দেখা উচিত যে, তাঁহাদের কার্য্য সর্ব্বতোভাবে কথার অনুযায়ী সত্য হয়।

কার্য্যে, লোকব্যবহারে, দৈনন্দিন জীবনে, সত্য অনুষ্ঠান ও সত্য আচরণ কবিবার জন্য স্বতঃ পরতঃ চেষ্টা করিতে হইবে। কথা ও কার্য্য যেন কখনও বিরোধী না হয় একটি যেন অপরটির প্রতিবাদ না করে। আত্মপ্রতিবাদ বড়ই বিড়ম্বনা।

সত্য সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, তাহাতে বুঝা গেল যে ব্যক্তিগত, জাতিগত, সমাজগত, সর্ব্ববিধ শৃঙ্খলা ও উন্নতির জন্য সত্যকে আশ্রয় করা কর্ত্তব্য। কার্য্যে, মনে ও বাক্যে, সত্যনিষ্ঠ হইতে হইবে। মন, বাক্য ও কর্ম্ম যেন সমবাদী হয়। তাহা হইলে আমরা যথার্থরূপে সত্যাচারী হইব। সত্যানুরাগী হইলে, সত্যে নিষ্ঠাবান হইলে, আমাদের অশেষ কল্যাণ হইবে। এইরূপে প্রত্যেক ব্যক্তি সত্যপরায়ণ হইলে, ব্যক্তির সমষ্টি যে জাতি, তাহাও সত্যপরায়ণ হইবে এবং তাহাতে জাতীয় উন্নতি হইবে। সমাজে সত্যজনিত বিশ্বাস আসিবে—বিশ্বাসজনিত সখ্য ও প্রীতির ভাব আসিবে—দেশ ও সমাজ অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিবে।

সুজলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা বসুমতী বীরেরই বাসের উপযুক্ত।

সাহস।

উপযুক্ত বীরই অপর সকলকে অতিক্রম করিয়া প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকেন। পুরাণ, ইতিহাস, কিম্বদন্তী ও অভিজ্ঞতা সকলই এ কথার যাথার্থ্য প্রমাণ করিতেছে। বীর-চরিত্রের অন্যান্য নানা উপাদানের মধ্যে সাহসই প্রধান। শারীরিক শক্তি, মানসিক বিদ্যাবুদ্ধি, নৈতিক নিষ্ঠা, যাহা কিছু থাকুক না কেন, সাহস না থাকিলে এ পৃথিবীতে, কেহ সসম্মানে তিষ্টিতে পারে না। উপযুক্ত ব্যক্তির এখানে স্থান আছে। আজ তুমি যে স্থান অধিকার করিয়াছ, সেখানে তোমার অপেক্ষা অধিকতর উপযুক্ত লোক আসিলে তোমাকে সে স্থান ত্যাগ করিতে হইবে। ধরিত্রীর বাল্যাবস্থা হইতে অদ্যাবধি সর্ব্বত্রই এই নিয়মে কার্য্য হইতেছে, এবং অনন্তকাল হইবে। কাহারও স্থলবিশেষে অধিকার, তাহার তৎকালীন তত্রস্থ অপর সাধা-রণের অপেক্ষা যোগ্যতরতার পরিচায়ক মাত্র। এ জীবন কেবল ক্ষুদ্র বৃহৎ সংগ্রামাবলীর সমষ্টিমাত্র—এ ক্ষেত্রে সাহস চাই—শত্রু শক্তিকে উপেক্ষা করিবার জন্য সাহস চাই। আপনার স্বত্ব বুঝিয়া লইবার জন্য, আপন ন্যায্য দাবী দাওয়া সাব্যস্ত করিবার জন্য, সাহস চাই। বুদ্ধি দ্বারা বিচার করিয়া কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিলে, নীতির নিক্তিতে তৌল করিয়া দেখিলে যে, তাহা ন্যায় সঙ্গত, শারীরিক শক্তি বিচার করিয়া দেখিলে যে কর্ত্তব্য সাধনের জন্য তাহা যথেষ্ট; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে কর্ত্তব্য সাধন করিবার সময় যদি সাহস না কুলায়, তবে সকলই পণ্ড হইবে। সেই জন্য পুনরায় বলিতেছি—সাহস চাই।

রণবীর, যোদ্ধৃগণের সাহসের কথা চিরকালই প্রসিদ্ধ। স্বদেশ প্রেমিক সাহসী বীরপুরুষগণকে বিজয়লক্ষ্মী বরণ করেন। সাহসী বীরপুরুষগণই বিজয়লক্ষ্মীর বরমাল্য পাইবার যোগ্য এবং তাঁহারাই তাহা পাইয়া থাকেন। রাজ্য রক্ষার জন্য, স্বদেশ রক্ষার জন্য, স্বাধী-

নতার জন্য, কত শত বীর প্রাণ দিয়াছেন—তাঁহাদের সাহসের কথা, বীরত্বের কথা, স্বদেশপ্রেমের কথা চিরকাল কীর্ত্তিত হইতেছে। প্রাণ দিয়া তাঁহারা অমর হইয়াছেন—কীর্ত্তি তাঁহাদিগকে বরণ করিয়াছে। যশের মন্দিরে, কীর্ত্তি মন্দিরে, এই সাহসী বীরপুরুষগণের স্মৃতি, জাগরিত আছে।

পৃথিবীর ইতিহাস অর্জ্জুন, অভিমন্যু, রামচন্দ্র, রাবণ, লক্ষ্মণ, মেঘনাদ, হেক্টর, একিলিস্, আলেকজাণ্ডার, সীজর, হানিবল, পুরু, পৃথ্বীরাজ, প্রতাপ, নেপোলিয়ন, ওয়েলিংটন, ক্লাইব, মোহনলাল প্রভৃতি অনেক রণকুশল সাহসী বীরের নামে পূর্ণ। ইঁহারা যশের জন্য, কীর্ত্তির জন্য, দুর্দ্দমনীয় রাজ্যলালসাতৃপ্তির জন্য অথবা স্বদেশ ও স্বাধীনতার জন্য পশুবলের সহিত যুদ্ধ করিয়াছেন। জাতীয় স্বাধীনতা, যশ বা কীর্ত্তি কামনায় তাঁহারা অনুপ্রাণিত হইয়াই তাদৃশ সাহসী হইয়াছিলেন।

এই এক শ্রেণীর বীর। ইহাঁদের দৈহিক বলবীর্য্য, সাহসের সহিত সম্মিলিত হয় এবং তদ্দ্বারা ইঁহারা নরশোণিত প্লাবিত যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রু শক্তিকে হীনপ্রভ করেন—পরাজয় করেন। জগতে ইহাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর আর এক শ্রেণীর বীর আছেন। ইহাঁরা, যশ, কীর্ত্তি বা ভূমির জন্য যুদ্ধ করেন না। ইহাঁরা, রাজার রাজা, মহান্ ঈশ্বরের সেনা। তাঁহারই আদেশে, তাঁহারই প্রেমরাজ্য বিস্তারের জন্য সতত উদ্যুক্ত। সত্যের জন্য, ন্যায়ের জন্য, জ্ঞানের জন্য, কর্ত্তব্যের জন্য ইহাঁরা মন প্রাণ মুহূর্ত্তে বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত। ইহাঁরা অপ্রেম, অশান্তি, পাপ, অজ্ঞানতা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে চিরকাল সমর ঘোষণা করিয়া আসিতেছেন। এই মহাপুরুষগণ অমর। এখনও তাঁহারা জীবিত। এই অনন্ত বিশ্বের দূরতম স্থানে, অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ রহিত অনন্ত প্রসারিত কালের একস্থলে, তাঁহারা বিশ্রাম সুখ অনুভব করিতেছেন মাত্র। দৃষ্টির বহিস্থ দূরবর্ত্তী সুগন্ধি পুষ্পের গন্ধ, বায়ুযোগে আসিয়া

যেমন মনপ্রাণ প্রফুল্ল করে, সেইরূপ তাঁহাদের অমরসত্তা স্মৃতিযোগে আসিয়া এখনও আমাদিগকে অনুপ্রাণিত করিতেছে—কর্ত্তব্যের পথে অগ্রসর হইবার জন্য উৎসাহ দিতেছে। চলিষ্ণু পথিক যেমন অগ্রগামী হইয়া ক্রমে দৃষ্টির অগোচর হয়, তেমনই এই মহাপুরুষগণ, অনন্তের পথে চলিয়া গিয়াছেন মাত্র। আকাশ ও কাল মধ্যবর্ত্তী হইয়া দৃষ্টিরোধ করিয়াছে মাত্র—অন্যথা তাঁহারা ত জীবিত আছেন। তাঁহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া আমরাও যেন সেই পথে চলিতে পারি।

এই প্রাতঃস্মরণীয় মহাপ্রাণগণ তাঁহাদের ভবিষ্য পুরুষগণের কল্যাণের জন্য, জগতের মঙ্গলের জন্য কি না করিয়াছেন? তাঁহাদের সমকালবর্ত্তী লোকেরা তাঁহাদের মর্য্যাদা বুঝিতে পারে না—অন্যথা তাহাদের হাতে তাঁহাদের এত নিগ্রহ হইত না। ঐ দেখ, সুদূর গ্রীসে, কালের দূরতম অতীতে, সক্রেটীসকে দেখ; তিনি জ্ঞানের আলোকে তমসাবৃত দেশকে, সমাজকে উদ্ভাসিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই অপরাধে তাঁহাকে বিষপান করিতে হইল- সামান্য দস্যু তস্করের ন্যায় রাজদণ্ড গ্রহণ করিতে হইল! মহাত্মা সক্রেটীস অবিচলিত চিত্তে, আত্মার অমরত্বের কথা কহিতে কহিতে সেই হলাহল হেমলক পান করিয়াছিলেন—জিজ্ঞাসা করি ইহা কিরূপ কার্য্য? ইহা কি সাহসী বীরের কার্য্য নহে? এখন এই সাহস আর সেকেন্দারের শৌর্য্য তুলনা করিলে কোনটী শ্রেষ্ঠ বোধ হয়?

আবার দেখ, নেপালের নিকটস্থ কপিলবস্তুর প্রতি দৃষ্টিপাত কর। পৃথিবীর এক তৃতীয়াংশ লোকের উপাস্য দেবতা, অপর সকলের আদর্শ পুরুষ, কপিলবস্তুর সেই রাজপুত্র,—শুদ্ধ বুদ্ধ শাক্যসিংহ কি করিয়াছিলেন? জগতের লোককে জরামৃত্যুর হাত হইতে ত্রাণ করা যখন তাঁহার কর্ত্তব্য বোধ হইল, তখন আর তাঁহাকে কে ধরিয়া রাখে? কর্ত্তব্য পালনের জন্য মায়ার বন্ধন কাটিলেন। নবযৌবন-সম্পন্না

সুন্দরী ভার্য্যা, সদ্যোজাত-সুকুমারকুমার, অতুল ঐশ্বর্য্য, এই সকল সুখ সম্ভোগ ত্যাগ করা কি কম সাহসের কথা?

ধর্ম্মবিশ্বাসের অনুরোধে, বিবেকের নির্দ্দেশে, মানুষ কতই না সাহসী হয়! কর্ত্তব্যজ্ঞান তাহাকে অদম্য উৎসাহ দেয়, বিবেক তাহাকে আশ্বাস দেয়, ধর্ম্মবিশ্বাস তাহাকে সাহস দেয়। মানব যখন এইরূপ ভাবে অনুপ্রাণিত হয়, তখন সে রাজশক্তি, সমাজশাসন সকলই তুচ্ছ জ্ঞান করে। পুণ্যভূমি ভারতে পবিত্র পঞ্চনদবিধৌত পঞ্জাবে, শ্রীগুরু নানকের শিষ্যদিগের মধ্যে শ্রীতেগ্ বাহাদুর তাঁহার অভূতপূর্ব্ব সাহসের জন্য শিখ সমাজে চিরপূজিত। মুসলমান সম্রাটের নিকট তাঁহার সেই "শির দিয়া ত শের নেহি দিয়া" কথা মনে করিলে আজও প্রাণে এক অপূর্ব্ব প্রসংশার ভাবে পূর্ণ হয়।

য়ুরোপে, খ্রীষ্টীয় জগতে, পোপের যখন দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ, মুকুটধারী রাজরাজেশ্বরগণ যখন তাঁহার অনুগ্রহ পাইবার জন্য সতত ব্যস্ত, সেই সময়, দরিদ্র অঙ্গারক বিক্রেতার পুত্র লুথারের অভিনব ধর্ম্মমত প্রকাশ করা, এই প্রকার সাহসের অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

লুথার পোপের প্রাধান্য উপেক্ষা করাতে খ্রীষ্টধর্ম্মগুরু পোপ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছেন। জর্ম্মানীর নিষ্ঠাবান খ্রীষ্টান সম্রাট, দরিদ্র প্রজার ঔদ্ধত্যে একান্ত রুষ্ট। সমগ্র খ্রীষ্ট সমাজ দরিদ্র লুথারের উপর বিরক্ত হইয়াছে ও বিধর্ম্মী অবিশ্বাসী নাস্তিক বলিয়া তাঁহার প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করিতেছে। সম্রাট, লুথারকে তাঁহার ধর্ম্মমত পরিবর্ত্তন করিতে বলিলেন, ভয় দেখাইলেন, কিন্তু লুথার অবিচলিত রহিলেন, বিবেক-বাক্য শুনিলেন, ধর্ম্মে ঈশ্বরের আশ্বাস বাণী শুনিলেন। এইরূপে, তিনি সাহসের উপর নির্ভর করিয়া সম্রাটসমীপে উপস্থিত হইলেন। অমাত্যবর্গ-পরিবৃত হইয়া সুশোভনা রাজসভা আলো করিয়া, সম্রাট সিংহাসনে সমাসীন আছেন। চারি দিকে দর্শকমণ্ডলী উদ্গ্রীব হইয়া

রহিয়াছে। লোকে মুক্তশ্বাস ফেলিতে পারিতেছে না—সকলেই উদ্‌গ্রীব ও উৎকর্ণ হইয়া রুদ্ধশ্বাসে উৎকণ্ঠার সহিত অনিমেষ লোচনে দেখিতেছে। দরিদ্র অঙ্গারকবিক্রেতার পুত্র কৃশকায় লুথারকে শাস্তি দিবার জন্য কেন এত আয়োজন? ক্ষুদ্র পতঙ্গ দলনের জন্য এত মত্ত মাতঙ্গের সমবায় কেন? লোকে এইরূপ চিন্তা করিতেছে, সভাস্থ সকলেই স্তব্ধ—নীরব—সম্রাটের ভয়ে সমীরণও যেন মন্দগতি অবলম্বন করিয়াছে। চারিদিকে যখন এরূপ ভাব তখন হঠাৎ নিস্তব্ধ নিশীথে কড় কড় কুলিশনাদে লোকে, যেমন ত্রস্ত হয়—আচম্বিতে চমকিয়া উঠে—তেমনই সমবেত সকলে—রাজা, প্রজা, ধর্ম্মযাজক, দর্শকমণ্ডলী শিহরিয়া উঠিলেন! কেন? কেন? ঐ দেখ, দরিদ্রসন্তান অগ্রসর হইয়া কি বলিতেছেন। লুথার বলিলেন, আমি এখানে দাঁড়াইলাম, আমি বিশ্বাসের অন্যথা করিতে পারি না - ভগবন্ আমার সহায় হও—এ কয়টী কথায় কি আছে যে সকলে কাঁপিল? রাজসিংহাসন টলিল?—এ কথাগুলিতে যাহা আছে তাহা সমবেত রাজন্যবর্গের মধ্যে, ধর্ম্মযাজক-মণ্ডলীতে—দর্শকগণের মধ্যে নাই। ঈশ্বরবিশ্বাসের উপর স্থাপিতসাহস ঐ কথা কয়টীতে প্রকাশ পাইয়াছিল।

ভগবানের এই বিচিত্র চিত্রশালায় এইরূপ কত কত দেবচরিত্র রহিয়াছে। এই সকল মহাপ্রাণব্যক্তিগণ, ধর্ম্ম, বিজ্ঞান ও বিশ্বাসের জন্য শোণিত দান করিয়াছেন। তাঁহাদের এক একবিন্দু পবিত্র শোণিতপাতে শত শত বীর জন্মিয়াছে। আজ আমরা তাঁহাদের অদ্ভুত আশ্চর্য্য সাহসের কথা শুনিয়া প্রাণে বল সঞ্চয় করিতেছি, সাহসে নির্ভর করিয়া, তাঁহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে চেষ্টা করিতেছি মাত্র।

লেখাপড়া শিখিয়া বুদ্ধিবৃত্তি প্রখরা করিয়া, সত্য মিথ্যা, কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্য অবধারণ করিলাম, কিন্তু তাহাতে কি ফল হইল? লোকে জানে সমুদ্রগর্ভে রত্নরাজি আছে, ভূগর্ভে বহুমূল্য মণিকাঞ্চন আছে—

আছে যে তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহাতে কি দারিদ্র্য দূর হয়? সত্য কি, ন্যায় কি, কর্ত্তব্য কি, পুণ্য কি তাহা জানিলেই কি পাপমোচন হয়? তাহাতে কি চরিত্র গঠন হয়? কর্ত্তব্য বুঝা এক, কর্ত্তব্য পালন করা আর। সত্য অবধারণ করা এক, সত্য আচরণ করা অন্য। প্রথমটী বুদ্ধি বিচার সাপেক্ষ, দ্বিতীয়টী সাহস সাপেক্ষ।

অন্যান্য সুশিক্ষার ন্যায় সাহসের প্রথম বিকাশ গৃহেই হওয়া উচিত। পিতামাতাকে এ বিষয়ে একটু বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। শিশুগণ স্বভাবতঃই চঞ্চল। এই চঞ্চলতাহেতু তাহারা অনেক সময় গৃহের অনেক সামগ্রী অপচয় করে এবং এই অপচয়ের জন্য, পিতামাতা প্রায়ই অযথা তর্জ্জন গর্জ্জন, এমন কি, অনেক সময় প্রহার পর্য্যন্ত করিয়া থাকেন। সামান্য অপচয়ের জন্য শাসনের মাত্রা অধিক হইলে, সৎশিক্ষার ব্যাঘাত হয়। পিতামাতার অত্যধিক তর্জ্জন গর্জ্জনে, শিশুগণ অনেক সময় সত্য গোপন করে, অথবা মিথ্যা বলে। সাহসশিক্ষার পক্ষে মিথ্যাকথা অত্যন্ত অপকারী। কোনও অন্যায় কার্য্য করিলে, তাহার জন্য দণ্ডভোগ করিতে হয়, এটী বুঝাইয়া দেওয়া উচিত এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, এরূপস্থলে দণ্ড কিরূপ হওয়া উচিত? এতদুত্তরে এই বলা যায় যে, দণ্ড যাহাতে শারীরিক না হয় তাহা বিশেষভাবে দেখিতে হইবে। শারীরিক দণ্ডে, শিশুগণের আত্মমর্য্যাদা যায়। তবে কেহ কেহ বলেন, যে, স্থল বিশেষে বিশেষ সতর্কতার সহিত স্বল্পমাত্রায় শারীরিক দণ্ডও উপকারী।

পিতামাতা ও অপরাপর হিতকাম পরিজনের সহিত শিশুগণ, সতত স্নেহ বন্ধনে আবদ্ধ। যদি তাহারা কোন কর্ম্ম করিয়া, পিতামাতা প্রভৃতির বিরক্তি উৎপাদন করে, এবং তজ্জন্য যথাসম্ভব কাল তাঁহাদের স্নেহ আদর ও যত্ন না পায়, তবে স্বতঃই তাহারা ঐ প্রকার কর্ম্ম হইতে বিরত হইবে। শিশুগণ যদি দেখে যে, পরিধেয় বস্ত্র, পড়িবার পুস্তক, খেলিবার সামগ্রী, তাহারা ইচ্ছা ও অসাবধানতাবশতঃ নষ্ট করিলে,

নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বে সেগুলির পরিবর্ত্তে নূতন জিনিস পাইবে না, এবং তাহাদিগকে ছিন্ন ভিন্ন ও বিকৃত দ্রব্য ব্যবহার করার অসুবিধা ও কষ্টভোগ করিতে হইবে, তবে ক্রমে, তাহারা আপনা আপনি সতর্ক ও সাবধান হইতে শিখিবে। এইরূপে নৈতিক সস্নেহ শাসন প্রচলন করিতে হইবে এবং সেই দণ্ড গ্রহণ করিবার জন্য তাহাদের সাহস থাকা যে আবশ্যক, ইহাও বুঝাইয়া দিতে হইবে। অপরত্র যে সকল শিশু, কর্ত্তব্য পালন করে, সত্যকথা বলে, তাহাদিগকে উৎসাহ দান ও প্রশংসা করিতে হইবে। ইহাতে একটা মিথ্যা ভয় চলিয়া যাইবে এবং সৎসাহস বৃদ্ধি পাইবে।

সাহসের পর বশ্যতার কথা, যেন কেমন শুনায়। সাহসের পর স্বাধীনতার কথাই লোকে আশা করে। স্বাধীনতা ও বশ্যতা বিরোধ-ভাবাপন্ন হইলেও বশ্যতা স্বাধীনতা-বর্দ্ধক। যে আজ্ঞা পালন করিতে জানে, সেই আজ্ঞা করিতে জানে। যে, গৃহে পিতামাতার আজ্ঞানুবর্ত্তী, বিদ্যালয়ে শিক্ষকের আদেশ পালনে তৎপর কর্ম্মস্থানে প্রভুর আজ্ঞাকারী, সমাজে প্রচলিত নিয়মের অধীন, রাজ্যে, রাজভক্ত ও আইন অনুসারে চলিতে উৎসুক সেই ব্যক্তিই স্বাধীনতা ভোগ করিবার উপযুক্ত। এত নিয়ম ও আজ্ঞা বন্ধনে, নাগপাশবদ্ধ সদৃশ হইলেও, সে ব্যক্তি গগনবিহারী বিহঙ্গের ন্যায় মুক্ত। ব্যক্তিগত, সমাজগত ও জাতিগত স্বাধীনতার নামে, স্বেচ্ছাচার ও উচ্ছৃঙ্খলভাব, চারিদিকে পরিদৃষ্ট হইতেছে। সন্তান অবাধ্য, শিষ্য উদ্ধত, যুবক স্বেচ্ছাচারী, ভৃত্য অবশ, প্রজা উচ্ছৃঙ্খল ও রাজদ্রোহী হইলে মনুষ্য-সমাজ কি ভয়ঙ্কর ভাব ধারণ করে! নরকের অপেক্ষাও তাহা ঘৃণ্য ও ভীতিপ্রদ হয়; নরকও যমের নিয়মতন্ত্র রাজ্য।

বশ্যতা।

এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বিধাতার বিধান। এই সৃষ্ট ব্রহ্মাণ্ডে বিধিবশে সকল কার্য্যই হইতেছে। চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র গ্রহ, উপগ্রহ, সলিল,

অনিল, অগ্নি ইত্যাদি সকলেই যথানিয়মে আপন আপন কার্য্য করিতেছে। প্রকাণ্ড উল্কাপাত ও ক্ষুদ্র আমলকপতন উভয়ই নিয়মেরই অধীনে হইতেছে। জড়জগতের স্থিতিগতি যেমন নিয়ম সমষ্টির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইতেছে, জীবজগতেও সেইরূপ নিয়ম অনুসারেই কার্য্য হইতেছে। আমাদের সত্ত্বাও নিয়মের অধীনে; জন্ম, জরা ও মরণ যথা নিয়মেই হইতেছে। উচ্ছৃঙ্খল উন্মার্গগামী হইতে যাওয়া ধৃষ্টতা ও বিড়ম্বনা মাত্র। প্রকৃত স্বাধীনতাপ্রয়াসী ব্যক্তিকে প্রথমে আজ্ঞা ও নিয়মের অধীনতা শিক্ষা করিতে হইবে, তবে সেই ব্যক্তি যথা সময়ে স্বাধীনতা পাইবার যোগ্য হইবে।

ছাত্রসাধারণের মধ্যে আজকাল, কেমন একটা অপ্রীতিকর উদ্দাম ও ঔদ্ধত্যের ভাব দেখা যাইতেছে। গৃহে তাহারা পিতামাতার আদেশ পালনে অনিচ্ছুক, বিদ্যালয়ে শিক্ষকের উপদেশের প্রতি অমনোযোগী, সমাজে পরস্পরের প্রতি অশিষ্ট। দেশে যে সচ্চরিত্র ছাত্র নাই, এমন নহে। তবে যাহাদের কথা বলা যাইতেছে, তাহাদের সংখ্যা অনেক এবং সংক্রামক পীড়াগ্রস্তের ন্যায় দিন দিন তাহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। এই সংখ্যা বৃদ্ধি হেতু, কি রাজা, কি শিক্ষক আর কি অভিভাবক, সকলেই দুঃখিত ও চিন্তিত। ছাত্রসাধারণ, দেশের আশা ভরসার স্থল। সুদূর ভবিষ্যতে তাহারাই জন সাধারণের স্থান অধিকার করিবে। তাহারাই কালে গৃহী হইবে; সমাজের দশজন, রাজ্যের প্রজাসাধারণরূপে পরিগণিত হইবে। সংসার, সমাজ ও রাজ্য তাহাদের দ্বারাই গঠিত, পোষিত ও বর্দ্ধিত হইবে। যদি সেই ছাত্রসাধারণ এখন হইতে অবাধ্য, উদ্ধত, অশিষ্ট ও উচ্ছৃঙ্খল হয়, তবে তাহা বড়ই পরিতাপের বিষয়। যে পঠদ্দশা জীবনের উদ্যোগ পর্ব্ব বলিয়া কথিত হইয়াছে, তাহা যদি এইরূপে কাটে, তবে ভবিষ্যতে উদ্‌যাপনের ভরসা কোথায়?

জানি না, ছাত্রসাধারণ কি ভাবদ্বারা প্রণোদিত হইয়া, এরূপ ঔদ্ধত্যের পরিচয় দিতেছে। কোনরূপ মতামত প্রকাশ্যে প্রচারের সময়, ছাত্রজীবন নহে। এ সময়, দেখিবার, শুনিবার, পড়িবার ও বুঝিবার সময়। এখন তত্ত্ব অনুসন্ধানের ও বিচারের সময়। এখন সকল বিষয় ভাল করিয়া, শিখিবার ও বুঝিবার সময়; যখন বয়োবৃদ্ধি সহকারে চপলতা ও চঞ্চলতা কমিয়া যাইবে—স্থিরবুদ্ধি আসিবে—তখনই ব্যক্তিগত স্বাধীনতার ও প্রকাশ্যে মতামত প্রচারের প্রকৃষ্ট সময়। সে দিন ত সম্মুখে রহিয়াছে, উহা পাইবার জন্য এত তাড়াতাড়ি, এত ব্যগ্রতা কেন? এ সুমধুর ছাত্রজীবন, পিতামাতার স্নেহমমতায়, শিক্ষকের সস্নেহ হিতগর্ভ উপদেশে, রাজার উৎসাহে কাটানই বুদ্ধিমানের কার্য্য—তাহাতে বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ দুইয়েরই মঙ্গল হইবে। যদি সেই মঙ্গল বাঞ্ছনীয় হয়, তবে উচ্ছৃঙ্খল স্বেচ্ছাচারী না হইয়া, বশে চলাই উচিত।

জীবের প্রবৃত্তি স্বাভাবিক। আহার, বিহার, ভোগ, নিদ্রা সকলই প্রবৃত্তিমূলক। সামান্য পশু হইতে মানব পর্য্যন্ত—এ বিষয়ে সকলেই সমান। তবে মানুষের বিশেষত্ব এই যে, সে এ প্রবৃত্তিকে সংযত করিতে পারে। আত্মসংযম মানবের একটী বিশেষ ধর্ম্ম। অন্যান্য গুণের ন্যায় ইহাও আয়াসলভ্য—এবং সাধনাসাপেক্ষ। মনুষ্যত্ব বহুল পরিমাণে আত্মসংযমের উপর নির্ভর করে। এই আত্মসংযম, শৈশব হইতে শিক্ষা করা আবশ্যক। মনে, মনে কত কামনার উদয় হয়, ইহার মধ্যে কত সঙ্গত ও কত অসঙ্গত থাকে, কত সাধ্য ও কত অসাধ্য থাকে। প্রবৃত্তির উত্তেজনায় সকলগুলি পূর্ণ করিতে প্রয়াস করিলে, মানুষকে পশুর অধম হইতে হয়। কাম, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতি রিপুগণ সততই মানুষকে চালিত করিতে চেষ্টা করিতেছে। মানুষ আত্মসংযম-হারা হইয়া,

আত্মসংযম।

যদি রিপুর দাস হয়, তবে তাহার নিকট কোন মনুষ্যোচিত কার্য্যের আশা করা যায় না। আমাদের প্রত্যেক কার্য্যটী সদ্বুদ্ধির দ্বারা, ধর্ম্মপ্রবৃত্তি দ্বারা সংযত হওয়া আবশ্যক। সাধারণতঃ আমাদের দৈহিক, বা মানসিক প্রায় সকল কার্য্যই প্রবৃত্তিমূলক কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্য ইহার কোন না কোন একটী আমাদের কার্য্যের মূলে দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের অনুষ্ঠিত কার্য্যে যদি রিপুপ্রাধান্য থাকে, তবে সেগুলি প্রায় গর্হিত হয়। ধন লাভের ইচ্ছা কাহার না হয়? কিন্তু অন্যের ধনে লোভ করা বড়ই গর্হিত—সেই লোভ সংযত করিয়া, নির্দ্দোষ অর্জ্জনস্পৃহা দ্বারা চালিত হইতে হইবে।

স্নেহশীল হওয়া ভাল; কিন্তু তাহা বলিয়া মোহান্ধ হওয়া উচিত নহে। ভালবাসাতেও আত্মসংযম আবশ্যক ক্রোধদ্বারা পরিচালিত হইলে, যে কি ভয়ঙ্কর ফল হয়, তাহা আমরা সকলেই নিত্য দেখিতেছি। বিশ্ববিজয়ী সেকন্দর শাহ কত শত প্রবল শত্রু পরাজয় করিয়াছিলেন, কিন্তু আত্মদেহগত-ক্রোধরিপু পরাজয় করিতে পারেন নাই। এক সময়ে সেকন্দর শাহ পারস্যে শিবিরসংস্থাপন করিয়া ছিলেন। শত্রুবিজয় হেতু সেখানে নিত্য বিজয়োৎসব হইতেছিল। সেই সময়ে একদিন জয়োল্লাসের মধ্যে তিনি অত্যধিক মদিরা পান করিয়া, সামান্য ক্রটিতে ক্রোধান্ধ হইয়া স্নেহের পাত্র সোদরপ্রতিম ধাত্রীপুত্রকে বধ করিলেন হায়! যিনি তৎকালপরিজ্ঞাত প্রায় সমস্ত ভূখণ্ড জয় করিয়াছিলেন, তিনি আত্মজয় করিতে পারিলেন না!

আত্মসংযমের অভাবে মানুষের কি দুর্গতি না হয়? নিত্য কত শত পশু বলি হইতেছে, তাহার কে গণনা করিয়া রাখিয়াছে? সেই সকল পশুসদৃশ কত শত মানুষ প্রবৃত্তির দাস হইয়া আত্মবলি দিতেছে, তাহারই বা কে গণনা করিয়া থাকে? তবে তাহারা কবি বা ঐতিহাসিকের কলমের কালরঙে চিত্রিত হইয়া অবাঞ্ছনীয় অমরত্ব ভোগ

করিতেছে তাহাদের দুই এক জনের কথা, এই কথা প্রসঙ্গে বড়ই মনে আসে—রাবণচরিত্র পাঠে, আত্মসংযমের অভাবের বিষময় ফল স্মরণ করাইয়া দেয়। রোমের সম্রাট নীরো, বাঙ্গালার নবাব সিরাজউদ্দৌল্লার কথা কে না জানে? আর বর্ত্তমান শতাব্দীর কবি বায়রণ ও আমাদের মধুচক্র-রচয়িতা শ্রীমধুসূদনের জীবন কাহিনী প্রতি পদেই আত্মসংযমের অভাবের কথা মনে করাইয়া দেন।

অসংযত ইচ্ছা লইয়া, জীবনযাপন করিতে যাইলে, লোকে পদে পদে বাধা পায়, লাঞ্ছিত হয়; একথা আর বেশী প্রমাণ দিয়া বুঝাইবার আবশ্যক নাই। অনেক পিতামাতা মোহান্ধ হইয়া শৈশবে সন্তানকে ইচ্ছা সংযত করিতে শিক্ষা দেন না। এই সকল পিতা-মাতার সন্তানই "চাঁদ চাওয়া" হয় এবং এই প্রকারে লালিত পালিত "আদুরে আব্দারে" সন্তানগণই কালে প্রবৃত্তির পীঠে আত্মবলি দেয়।

গৃহপ্রাঙ্গণই সকল সুশিক্ষার সূচনার প্রকৃষ্ট ভূমি। আত্মসংযমের শিক্ষার জন্যও ইহাই প্রশস্ত স্থান। গৃহে, সন্তানের অত্যধিক ও অসঙ্গত আব্দার গ্রাহ্য করা উচিত নহে অধিকন্তু ঐরূপ বাসনা প্রকাশ করিলে, বালককে শাসন করা আবশ্যক। ঐরূপ করিলে, ক্রমে বালক বাসনা সংযত করিতে শিখিবে। এই সংযম শিক্ষার সময়, ধৈর্য্য শিক্ষা আরম্ভ হয়। সংযতেচ্ছা-প্রণোদিত কার্য্য সম্পন্ন হইতেও সময় লাগে। আলাদিনের ন্যায় ঐন্দ্রজালিক প্রদীপের স্পর্শ মাত্রে তৎক্ষণাৎ কাহারও কোন কার্য্য সাধিত হয় না। যখন সকল কার্য্যেই অল্প বিস্তর সময় লাগে, তখন, ধৈর্য্য শিক্ষা না করিলে, কিরূপে চলিবে? ধৈর্য্য, সংযম শিক্ষার একটী প্রধান সহায়।

শৈশবকাল হইতেই পানাহারে সংযম শিক্ষা আবশ্যক। অপরিমিত পানাহার নানা প্রকার দুর্গতির কারণ। বাল্যে পিতামাতা এ বিষয়ে

দৃষ্টি রাখিবেন, পরে বয়োবৃদ্ধি-সহকারে, অভ্যাস-যোগে পানাহারে সংযম সহজ হইয়া উঠিবে।

কথাবার্ত্তায় সংযতজিহ্ব হওয়া আবশ্যক। অনিয়ন্ত্রিত রসনা নানা অনিষ্টের মূল। আহার বিষয়ে কেবল রসনার তৃপ্তি সাধন করিতে গেলে অনেক বিপত্তি ঘটে। আবার, বাগিন্দ্রিয় অসংযত হইলে তদপেক্ষা অধিক বিপত্তি ঘটিবার সম্ভাবনা। বাচালতা, কর্কশভাষণ, তীব্রব্যঙ্গোক্তি বা নিন্দাবাদ করা অসংযত জিহ্বার কার্য্য। সর্ব্বত্র জিহ্বাকে সংযত রাখা কর্ত্তব্য। স্থান অস্থান, সময় অসময় ও পাত্র অপাত্র বিবেচনা না করিয়া কথা বলা বড়ই গর্হিত। অনেক সময় কোন বিষয়ে হঠাৎ মতামত দিতে, কোন রহস্য বা মন্ত্রভেদ করিতে অথবা বাক্‌চাতুরী করিতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু এইরূপ ইচ্ছার প্ররোচনায় কার্য্য করিলে অনেক স্থলেই বিশেষ অনিষ্ট হয়। অতএব এরূপ স্থলে বিশেষ সাবধান হওয়া আবশ্যক।

সংক্ষেপতঃ, কথিত আর লিখিত, উভয়বিধ ভাষাই সংযত হইবে। অসংযত ভাবে লেখনী চালনারও নানা দোষ। দ্বিজিহ্বা লেখনী, অনিয়ন্ত্রিত ভাবে চালনা করিলে, অনেক সময় গরল উদ্গিরণ করে। এ হলাহল সম্বন্ধে সাবধান হইতে হইবে।

প্রবৃত্তি ও রিপুজয় না করিতে পারিলে, মানবকে অশেষ ক্লেশ পাইতে হয়। প্রবৃত্তি ও রিপুর দাস হইয়া, কে কোথায় সুখী হইয়াছে? প্রবৃত্তি ও রিপুকে যিনি সংযত রাখিতে পারেন, তিনিই স্বাধীন।

আজকালকার দিনে আত্মসংযমের বড় অভাব হইয়াছে। সামাজিক শাসন শিথিল হওয়াতে, বয়োজ্যেষ্ঠগণের মতামতের প্রতি উদাসীন হওয়াতে এবং শেষে, ব্যক্তিগত স্বাধীনতাজ্ঞানের অত্যধিক বৃদ্ধিতে, লোকে ইচ্ছাপূর্ব্বক আর বড় আত্মসংযম করিতে চাহে না।

যে ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু, জীবনকে মহাব্রত জ্ঞান করিতেন, যে হিন্দু, সামান্ত কোন ব্রতের পূর্ব্বে সংযম আচরণ করিতেন, আজ কালবশে তাঁহাদের সন্তানগণ আত্মসংযম-হারা হইয়া কি হইয়াছে! জরা বিনা বৃদ্ধত্ব, অকালমৃত্যু, অভাব অশান্তি সর্ব্বত্র বিভীষিকা বিস্তার করিতেছে। আজ আব কেহ ব্রতরত নহে! কাজেই সে উদ্যোগ, সে সংযম ও সে উদ্‌যাপনও নাই। সে উদ্বোধনও হয় না, সে উদ্‌যাপনও হয় না। এখন বোধনের দিনে বিসর্জ্জন হইতেছে। হে ভগবন্, দেশের দুর্গতির একশেষ হইয়াছে—আর না—আমাদিগের মতিগতি ফিরাও—আত্ম-সংযমের শক্তি দেও।

কবি একস্থলে বলিয়াছেন:—

উদ্যম।

কেন পান্থ ক্ষান্ত হও হেরে দীর্ঘ পথ।
উদ্যম বিহনে কার পূরে মনোরথ॥

মানবের সর্ব্বাঙ্গীণ ও সম্যক বিকাশই তাহার মনোরথ হওয়া উচিত। সেই মনোরথ পূর্ণ করিবার জন্য কতই না সাধনা করিতে হয়? এই সাধনা কোথাও বা সহজ কোথাও বা অত্যন্ত দুরূহ। কিন্তু তাহা বলিয়া ভগ্নোদ্যম হওয়া উচিত নহে। যদি দেহ সবল ও সুস্থ হইল, মন যদি জ্ঞানে উন্নত হইল, সদ্‌বুদ্ধি ও সদ্বিচারে যদি কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ হইল, তবে তাহা কার্য্যে অনুষ্ঠিত করিবার কালে উদ্যমের অভাব কি ভাল দেখায়? এই নৈতিক ও শারীরিক কাপুরুষতার দিনে পুরুষকার চাই। পৃথিবীতে অনেক সৎকার্য্য উদ্যমের অভাবে হয় না। সংগৃহীত শুষ্ক ইন্ধন প্রজ্জ্বলনের জন্য যেমন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ আবশ্যক হয়, তেমনই সকল সৎকার্য্যের সর্ব্বপ্রকার আয়োজন থাকিলেও তাহার অনুষ্ঠানের জন্য উদ্যমের প্রয়োজন হয়। এই জন্য বলিতেছিলাম, উদ্যম চাই, উৎসাহ চাই। উদ্বুদ্ধ হইয়া কার্য্যে রত হইতে হইবে। সাহসের সহিত সহিষ্ণুতার সহিত সাধনা করিতে হইবে, তবে সিদ্ধিলাভ

হইবে। উদ্যোগী সিদ্ধ পুরুষগণ চিরকালই কীর্ত্তিমন্দিরে যশঃকীর্ত্তনের সহিত বরিত হইয়া থাকেন।

আশা ও বিশ্বাস।

উদ্যম, উৎসাহ যাহা কিছু বল, সকলই আশার উপর স্থাপিত। আশা আবার বিশ্বাসের উপর স্থাপিত হওয়া উচিত। নতুবা তাহা ক্ষণস্থায়ী আলোকের ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া পুনরায় তৎক্ষণাৎ নিভিয়া যায়। এই কঠোর সংসার ভূমিতে, এক আশায় বুক বাঁধিয়া কত লোক কত কার্য্য করিতেছে। এই সংসার-সাহারায়, এই মর্ত্ত্যমরুভূমিতে, জরামৃত্যুজনিত উষ্ণ নিশ্বাস-বায়ুতে যখন চারিদিক পরিপূরিত হয়—যে সময় স্নেহময়ী জননীর অমৃতময়ী বাণী পর্য্যন্ত শ্রুতিগোচর হয় না—সহৃদয় বন্ধুগণের স্নিগ্ধ সহানুভূতিটুকু পর্য্যন্ত দুর্লভ হয়—তখনও মানুষ জীবিত থাকে, উঠে, কাজ করে, উৎসাহের সহিত সংগ্রামে পুনঃপ্রবৃত্ত হয়, কে তখন তাহাকে সজীব রাখে? কে তাহার সেই শ্রান্তক্লান্ত দেহমনকে সুস্থ করে?—"আশা"। স্নেহময়ী জননীর সুশীতল ক্রোড়ের ন্যায় মানুষ এ সময় আশার ক্রোড়ে শ্রান্তক্লান্ত মাথাটী রাখিয়া বিশ্রাম করে, পুনরায় তাহারই বক্ষে অনন্ত সুধাধারা পান করিয়া সঞ্জীবিত হইয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। অতএব দেখা যাইতেছে উদ্যম, উৎসাহ এবং আমাদের জীবন পর্য্যন্ত, আশা দ্বারা রক্ষিত হইতেছে। মঙ্গলময় বিধাতার শত সৃষ্টি-রহস্যের মধ্যে "মানব হৃদয়ে আশা" অন্যতম। আশা, ভগবানের আশ্বাসবাণী—যদি আশায় মানুষ ভগবানের আশ্বাসবাণী না শুনিত, অনন্ত স্বর্গ-সুখের কথা না শুনিত, তবে কিসের জন্য এত লোক ধর্ম্মের সেবা করিত? কিসের জন্যই বা লোকহিতব্রত, আর কিসের জন্যই বা এই সব দীক্ষা? আশার প্রভাবে মানব, ভগবানের আশ্বাসবাণী শুনে ও তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া সর্ব্বপ্রকার কঠোর সাধনার জন্য প্রস্তুত হয়।

থিবীতে দেখা যায়, যে একই বস্তু কাহারও পক্ষে অমৃত হয়, কাহার পক্ষে গরল হয়। এমন যে আশা, তাহাও কাহারও নিকট মরীচিকা বোধ হয়। কল্পনাসর্ব্বস্ব কবি, আশার কত নিন্দাবাদ করেন; আশাকে ছলনা করিতে দেখেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা ভ্রম মাত্র। সাধারণ লোকে, মোহজনিত কল্পনা এবং যুক্তি ও বিচার দ্বারা স্থিরীকৃত বিশ্বাসের উপর স্থাপিত আশার মধ্যে কি পার্থক্য তাহা সহজে বুঝিতে পারে না। সেই জন্যই লোকে অনেকস্থলে নিরাশ হয়, ভগ্নোৎসাহ হয়, অবিশ্বাসী নাস্তিক অপেক্ষাও ভয়ঙ্কর জীব "বিধাতার নিন্দুক" হয়—তাঁহার কার্য্যের ছিদ্রান্বেষী সমালোচক হয়।

এ বিশ্বে বিসদৃশ ঘটনার অভাব নাই। কিন্তু সেরূপ ঘটনাও বিধাতার নিয়মের বহির্ভূত নহে। তবে যে, আমরা বুঝিতে পারি না, তাহার কারণ, আমাদের জ্ঞান সান্ত ও অল্প। অনেক ঘটনা প্রথম দৃষ্টিতে বড়ই বিস্ময়জনক বলিয়া বোধ হয়। পৃথিবীতে কত সাধু চেষ্টা বিফল হইতেছে, কত দুষ্ক্রিয়া সফল হইতেছে, কত ধর্ম্মাত্মা নিগৃহীত হইতেছেন, কত দুরাত্মা আদৃত হইতেছে, কিন্তু তাহা বলিয়া পাপে আসক্তি ও পুণ্যে বিরক্তি হওয়া কি উচিত? কখনই নহে।

সৎকর্ম্ম কখন বিফলে যায় না। কারণ, সমগ্র মানবজাতির চরম উন্নতির জন্য প্রত্যেক সৎকার্য্যই অল্প বিস্তর সাহায্য করে। অনেক সৎকর্ম্ম আবদ্ধ হইয়া পড়িয়া থাকে; এক জনের জীবদ্দশায় যাহা সম্পন্ন না হয়, তাঁহার ভবিষ্যপুরুষগণ তাহা সমাপন করিতে পারেন। সভ্যতার ইতিহাসে ইহার উদাহরণ বিরল নহে। বাষ্প ও তাড়িতের আবিষ্কর্ত্তৃগণ, প্রথমে, বাষ্প ও তাড়িতের গুণ ও ধর্ম্ম ইত্যাদি সামান্যই জানিতে পারিয়াছিলেন। এখন তাঁহাদের পরবর্ত্তী পুরুষগণ, এ সকল বিষয়ের কতই না উন্নতি করিয়াছেন ও করিবেন। পিতা যে কার্য্য অপূর্ণ রাখিয়া চলিয়া যান, উপযুক্ত পুত্র তাহা সমাপন করিয়া থাকেন।

সাধারণতঃ আমরা দেখিতে পাই, যে পিতা কোন অট্টালিকা আরম্ভ করিয়া অসম্পূর্ণ অবস্থায় রাখিয়া পরলোক গমন করিলে, উপযুক্ত সন্তান কালে তাহা সম্পূর্ণ করিয়া পিতার ইচ্ছা পূর্ণ করেন। সেইরূপ এ বিপুল মানবসমাজের সভ্যতাসৌধ গঠনের জন্য অতি সামান্য সৎচিন্তা এবং সৎকার্য্যও ক্ষুদ্র ইষ্টকখণ্ডের ন্যায় সহায়তা করিয়া থাকে। আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী পুরুষগণ এই সভ্যতাসৌধের কতক অংশ নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছেন, অবশিষ্ট অংশের যতটুকু আমাদের জীবনে সম্ভব, তাহা আমরা করিব, এবং অবশিষ্ট অসমাপ্ত অংশ, আমাদের পরবর্ত্তী পুরুষগণ করিবেন। ধর্ম্ম, বিজ্ঞান ও সাহিত্য প্রভৃতির ক্রমবিকাশ এইরূপেই হইতেছে এবং হইবে। অতএব দেখা যাইতেছে, যে, কোন সৎকর্ম্মই বিফলে যায় না। বিধাতার এ বিশ্ব, তাঁহার মঙ্গল বিধান। এখানে যাহা সৎ, তাহাই সনাতন। এখানে পুণ্যের জয় ও পাপের পরাজয়। আপাত দৃষ্টিতে কোথাও কোথাও ইহার ব্যতিক্রম দেখিয়া, প্রাগুক্ত সত্যের বিপরীত সিদ্ধান্ত করা কখনই সুবুদ্ধির পরিচায়ক নহে।

যে সকল স্থলে, এইরূপ ব্যতিক্রম দেখা যায়, সে সকল স্থানেও "সৎকর্ম্ম বিফলে যায় না এবং সত্য ও পুণ্য শেষে জয়যুক্ত হয়" এই মহাসত্যে দৃঢ়বিশ্বাস করিতে হইবে। জগতের মহাপুরুষগণ এই বিশ্বাসের বলেই, এই বিশ্বাসের উপর স্থাপিত আশাতেই, ধন, প্রাণ, সুখ, ঐশ্বর্য্য সকলই ত্যাগ করিয়া থাকেন। এই সকল মহাপ্রাণব্যক্তিগণ তাঁহাদের জীবদ্দশায় তাঁহাদের উদ্ভাবিত সত্য, ধর্ম্ম, বা কোন বৈজ্ঞানিক মত, সাধারণ্যে গৃহীত বা আদৃত না হইলে, দুঃখিত বা নিরাশ হয়েন না। তাঁহাদের অশ্রু ও শোণিতসিক্ত ধরায়, তাঁহাদের উপ্তবীজ অঙ্কুরিত না হইলে বীজের প্রতি সন্দিহান বা নিরাশ হয়েন না। তাঁহারা জগতের "উত্তরাধিকারিত্বে" পূর্ণ বিশ্বাস করেন।

আর এই বিশ্বাসে আশান্বিত হইয়া তাঁহারা আপন আপন কার্য্য করিয়া চলিয়া যান। এই সকল মহাপুরুষগণের তিরোভাব হইলে ইঁহাদের পরবর্ত্তী পুরুষগণ তাঁহাদের স্থানে উত্তরাধিকারীসূত্রে স্বত্ববান হয়েন। জগতের এই গূঢ়তত্ত্বে বিশ্বাস ও তদনুযায়ী কার্য্য দ্বারা মানবের মহত্ত্ব পরিমিত হয়। এই নিয়মে, জগতের সভ্যসমাজে কার্য্য হইতেছে। এই বিশ্বাস ও আশার দ্বারা পৃথিবীতে কত অলৌকিক কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে, হইতেছে এবং হইবে। কি বিজ্ঞান, কি সাহিত্য, কি স্বদেশহিতৈষিতা কি লোকহিতব্রত, আর কি ধর্ম্ম—সকলই ইহা দ্বারা উপকৃত হইতেছে। য়ুরোপের বিজ্ঞানবীরগণের জীবনচরিত পাঠ করিলে, ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। গ্যালেলিও তাঁহাদের মধ্যে একজন প্রধান। সাহিত্যে, মিলটন ও মধুসূদনের নাম করা যাইতে পারে। স্বদেশহিতৈষিতায় পুরু, প্রতাপ, ব্রুস, গ্যারিবল্ডী প্রভৃতি কত নাম করিব? বিশ্বজনীন প্রেমের ধারা প্রবাহিত করিতে, বুদ্ধ, শ্রীচৈতন্য, হাউয়ার্ড, লিনকন প্রভৃতি প্রেমাবতারগণ কতই না করিয়াছেন। আর আত্মধর্ম্ম ও বিশ্বাসের জন্য, ভগবানের কৃপায় দৃঢ় বিশ্বাস ও আশা স্থাপনের জন্য, কত মহাপ্রাণই প্রাণ দিয়াছেন। ধ্রুবের অসামান্য ভক্তি ও বিশ্বাসের কথা, প্রহ্লাদের অসাধারণ নিষ্কাম-ভক্তির বিশ্বাসের কথা শুনিলে এখনও গাত্রে রোমাঞ্চ হয়। মহাত্মা যীশুর ক্রুশে প্রাণত্যাগের কথাই বা কে না শুনিয়াছেন?

এই সকল দেখিয়া শুনিয়াও কি আশা ছলনা করে বলিতে হইবে? সকল লোকেরই সদ্বুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হইয়া কর্ম্মশীল হওয়া উচিত। কর্ম্মই মানবের আয়ত্তাধীন। কর্ম্মে নিষ্ঠা ও উদ্যম চাই, এবং নিষ্ঠা ও উদ্যম স্থায়ী করিতে হইলে আশা চাই। আর সেই আশা পূর্ণ করিতে হইলে ভগবানে ভক্তি ও তাঁহার কৃপায় ও মঙ্গল বিধানে দৃঢ় বিশ্বাস চাই।

আশায় অধ্যবসায় আসে। সকল কর্ম্ম সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে হইলে অধ্যবসায় আবশ্যক। প্রথমতঃ দেখা যায় যে, সকল কার্য্য সমাধা করিতে হইলে অল্প বিস্তর সময় লাগে। দ্বিতীয়তঃ কোন কার্য্য নির্ব্বিঘ্নে হইবে, এরূপ আশা করা যায় না। অনেক সময় সৎকর্ম্মেও পদে পদে বাধা ঘটে। এই সকল অতিক্রম করিবার জন্য চরিত্রে অধ্যবসায় থাকা আবশ্যক। অধ্যবসায়ীর সম্মুখে অত্যুচ্চগিরিপ্রমাণ বাধাও ক্ষুদ্রতম বল্মীকের ন্যায় বোধ হয়। অন্যথা অধীর হইলে, ব্যস্ত হইলে, আমরা সামান্য বাধা পাইবামাত্র পশ্চাদ্‌পদ হইব—ভীত হইয়া ভগ্নোদ্যম হইব। সেই জন্য মানবচরিত্রে অধৈর্য্য ও ব্যস্ততা এত নিন্দনীয়।

অধ্যবসায়

সাধারণতঃ তিন শ্রেণীর লোক দেখা যায়।

(১ম) ইঁহারা কোন কর্ম্মেই প্রবৃত্ত হয়েন না, দিন আসিতেছে, যাইতেছে, কোন রকমে সুখে দুঃখে দিন কাটাইয়া দিয়া থাকেন।

(২য়) ইঁহারা সৎস্বভাব ও কর্ম্মেচ্ছু। ইঁহারা কর্ম্ম আরম্ভ করেন বটে, কিন্তু ইঁহাদের প্রবৃত্তি, শক্তি ও উদ্যম সত্ত্বেও একটী গুণের অভাবে আরব্ধ কার্য্য অসম্পূর্ণ অবস্থায় ত্যাগ করেন। কার্য্য সমাপন তাঁহাদের দ্বারা হয় না।

(৩য়) ইঁহারা না বুঝিয়া, না বিচার করিয়া, কোন কর্ম্মে হঠাৎ প্রবৃত্ত হয়েন না। ইঁহারা প্রথমে কর্ম্ম ও আত্মশক্তির বিচার করিয়া লয়েন; পরে যুক্তিযুক্ত বোধ হইলে কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন এবং সকল বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া আরব্ধ কর্ম্ম সমাপন করেন।

পৃথিবীতে মধ্য শ্রেণীর লোকই অধিক। এখানে নিশ্চেষ্ট, যত্নবিমুখ শ্রেণীর লোক যেমন কম, আবার সচেষ্ট উৎসাহী ও অধ্যবসায়ী কৃতকর্ম্মা লোকও তেমনই বিরল। প্রায়ই দেখা যায়, মধ্য শ্রেণীর লোকেরা সাধারণতঃ ভাল লোক, তাঁহাদের ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান আছে; ভাল মন্দ

বুঝেন, ভাল হইবার ইচ্ছা রাখেন—কিন্তু ইঁহাদের চরিত্রে অধ্যবসায় নাই ; সেই জন্য তাঁহারা সকল সত্ত্বেও কৃতী হইতে, সফল কাম হইতে পারেন না। ইঁহাদের প্রবর্ত্তিত প্রায় অনুষ্ঠানই পণ্ড হয়। কিন্তু ইঁহারা চিরকালই কৃতিপুরুষদিগের অনুকরণ ও অনুসরণ করেন। ইঁহারা চালিত, আর কৃতিপুরুষগণ চালক ও নেতা। যাঁহারা শিক্ষার গুণে, অধ্যবসায়ী হয়েন তাঁহারাই কৃতী ও সফলকাম হয়েন। সাধারণতঃ সংসারে কৃতী, যশস্বী হইতে হইলে, প্রতিভার তত আবশ্যক করে না। সৌভাগ্যসৌধ, কীর্ত্তিমন্দির গঠন করিবার জন্য, সাধুতা পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ই প্রধান উপকরণ। বিদ্যা, বুদ্ধি, ধন, মান ও যশ—এ সকল, প্রতিভাসাপেক্ষ নহে। প্রতিভা একটী কোন অতিমানবিক শক্তি নহে। লোকের অত্যধিক অধ্যবসায় ও কার্য্যশক্তিই প্রতিভার অন্য নাম। যাহা কিছু শিক্ষা করা যায়, বুঝা যায় ও অনুষ্ঠান করা যায়, তাহাকে সফল করিতে হইলে, অধ্যবসায় আবশ্যক। অধ্যবসায়ের অভাবে এ সকলই পণ্ড হয়। জ্ঞানযোগী, ধর্ম্মযোগী, কর্ম্মযোগী আর যিনিই হউন না কেন, তাঁহার সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে, অধ্যবসায় আবশ্যক।

শিষ্টাচার।

এতাবৎ আত্মোৎকর্ষের প্রতি মুখ্যভাবে লক্ষ্য রাখিয়া শারীরিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক ও নৈতিক বিকাশ ও উন্নতির কথা বলা হইয়াছে। এই বিকাশ ও উন্নতি জন-সমাজের মধ্যেই হইতেছে ; কারণ, মানব সামাজিক জীব। সমাজ ব্যক্তিসমষ্টিমাত্র। ব্যক্তিগত উন্নতি ও উৎকর্ষের উপর সামাজিক উন্নতি ও উৎকর্ষ নির্ভর করে। উন্নত ও বিকশিত জীবন লইয়া, মানব সমাজেই বাস করিয়া থাকে। এই সমাজ শিষ্টসমাজ, শিষ্টসমাজে শিষ্টাচারের প্রয়োজন। অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় শিষ্টাচারও শিক্ষাসাপেক্ষ। পরস্পরের সুখ সুবিধা ও প্রীতিবিবর্দ্ধক কতকগুলি নিয়মের অনুবর্ত্তনের

উপর শিষ্টাচার স্থাপিত। শিষ্টাচার সম্পর্কীয় নিয়মগুলি সকলেরই জানা কর্ত্তব্য। এখানে এতৎসম্বন্ধীয় স্থূল স্থূল কথাগুলি লিখিত হইতেছে।

শিষ্টাচার আচরণের পূর্ব্বেই প্রকৃতি বা "মেজাজের" কথা আসে। প্রকৃতি মধুর হওয়া আবশ্যক। যাহার স্বভাব খিট্‌খিটে, প্রকৃতি কর্কশ, এবং মেজাজ সর্ব্বদা গরম, সে কিরূপে শিষ্টাচার আচরণ করিবে? মুখখানি সদাপ্রসন্ন রাখিতে হইবে। লোকের সহিত সহাস্যে কথা বার্ত্তা কহিতে হইবে। এই হাস্যমুখের মূল্য অনেক। কেবল এই ঈষৎ হাস্যদ্বারাই কত সংলগ্ন, অসংলগ্ন, কত প্রাসঙ্গিক, অপ্রাসঙ্গিক কথার উত্তর দেওয়া যায়। সহাসদৃষ্টি দ্বারা কত লোককে প্রীত করা যায়। সদানন্দ সাধু, কৃতী সাংসারিক, কুটরাজনীতিজ্ঞ, সকলেই ইহা দ্বারা অনেক কার্য্য করিয়া থাকেন। সাধাবণ লোকের বহুবিধ, বহুল প্রশ্নের এমন সংক্ষেপ উত্তর আর দ্বিতীয় নাই।

প্রকৃতি মধুর হওয়া আবশ্যক। যাঁহাবা মধুর প্রকৃতির লোক, তাঁহাদের বড় কেহ অমিত্র থাকে না। এ সংসারে অপ্রীতিকর বিরক্তি-জনক দ্রব্য ও ঘটনার অভাব নাই। অপরদিকে আবার এইখানেই কত প্রীতিকর আহ্লাদজনক পদার্থনিচয়ের সমাবেশ দেখা যায়। যাঁহার প্রকৃতি মধুর, চিত্ত সদাপ্রসন্ন যিনি স্বয়ং রসজ্ঞ ও হৃদয়বান্, তাঁহারই জন্য ফুল ফুটে, তারা উঠে, উষা অরুণিমা আনয়ন করে। সেই হৃদয়বান পুরুষের জন্যই সরিৎ সুধা বহন করে, মলয় সুশীতল অনিল পাঠাইয়া দেয়, ইন্দু কৌমুদী বিতবণ করে। তাঁহারই ভাবাবেশের জন্য নীল নীরধি প্রশান্ত, নক্ষত্রখচিত নভোমণ্ডল অনন্ত প্রসাবিত। তাঁহারই পবিত্র সৌন্দর্য্যগ্রাহিণী বৃত্তির তৃপ্তির জন্য নিশা শেষে শশিকলা বিকলা হয় বলিয়া, দিবসাত্যয়ে নলিনী মলিনী হয় বলিয়া, ভগবান রমণীমুখ সৃজন করিয়াছেন। যাঁহাব চিত্ত এইরূপ সকল বস্তুতে আনন্দ

উপভোগ করিতে পারে, তিনি যে নিত্যানন্দ হইবেন তাহাতে আর সন্দেহ কি ? তিনি স্বতঃই শিষ্টাচারী হইবেন। তাঁহার প্রোজ্জ্বল চক্ষুর প্রীতিপূর্ণ দৃষ্টিতে, তাঁহার ঈষৎ হাস্যে ও কুশলপ্রশ্নে লোকে কতই না প্রীত হয়। সেইজন্য বলিতেছিলাম, শিষ্টাচার প্রথমতঃ মধুর প্রকৃতির উপর নির্ভর করে।

শত বর্ষ পূর্ব্বে বঙ্গের সামাজিক রীতি নীতি যেরূপ ছিল এখন তাহার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। অনেক স্থলে অনেক বিষয়ে আমূল পরিবর্ত্তন হইয়াছে। সে কালের চতুষ্পাঠীতে পাঠ এখন সর্ব্বত্র নাই। সুতরাং তৎকালের ছাত্রনীতিও সাধারণ নহে, গুরুকে পাদ্য অর্ঘ দান, ভক্তিতঃ প্রণাম, এখনকার স্কুল কালেজে প্রচলিত হইতে পারে না, নানা কারণে তাহা অসম্ভব। কিন্তু বর্ত্তমান সময় ও সমাজের অনুমোদিত কতকগুলি ছাত্রনীতি প্রচলিত ও আচরিত হওয়া আবশ্যক। শিক্ষক মহাশয় ক্লাসে আসিলে ছাত্রগণ সর্ব্বত্র সসম্ভ্রমে দণ্ডায়মান হয় না। বিদ্যালয়ের উচ্চ শ্রেণীতে বয়োজ্যেষ্ঠ ছাত্রগণ ইহার জন্য বিশেষ অপরাধী। আজকাল ছাত্রসমাজে একটা ঔদ্ধত্যের ভাব আসিয়াছে। রাজা, প্রজা, শিক্ষক, অভিভাবক সকলেই ইহার জন্য অনুযোগ করেন। সকল সমাজেই পরিবারস্থ গুরুজন, ভদ্রমহিলা, বয়োজ্যেষ্ঠ ভদ্রলোক, ধর্ম্মযাজক, শিক্ষক, বিশিষ্ট রাজপুরুষগণ সম্মানের পাত্র। ইঁহাদিগকে সম্মান প্রদর্শন করিয়া ছাত্রগণ তাঁহাদের সম্মান আর কি বৃদ্ধি করিবেন, ইহাঁদিগকে সম্মান করিলে নিজেরাই সম্মানিত হইবে। বিদ্যালয়ে সভাসমিতিতে, ছাত্রগণের নানা প্রকার অশিষ্ট আচরণের কথা প্রায় শুনা যায়। ইহা বড়ই পরিতাপের বিষয়। পিতামাতা ও অন্যান্য গুরুজনের উপদেশমত কার্য্য করিয়া ও অন্যান্য প্রকারে তাঁহাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে হইবে। বিদ্যালয়ে, শিক্ষককে সসম্মান অভিবাদন ও মনোযোগের সহিত স্থির হইয়া তাঁহার

উপদেশ শ্রবণ করা উচিত। সভা সমিতিতে ও অন্যান্য সময়ে রাজ-পুরুষগণের সমাগমে যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করিতে হইবে। সর্ব্বথা শিষ্টাচরণ করিতে হইবে। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে পঠদ্দশা জীবনের উদ্যোগ পর্ব্ব। এই উদ্যোগকালে, বিদ্যালয়ে ছাত্রজনোচিত শিষ্টাচার করিতে হইবে। তাহা হইলে, কালে, সমাজে সজ্জন, রাজ্যে রাজ-ভক্ত প্রজা, ও সুসভ্য নাগরিক, পরিবার মধ্যে কৃতী সাংসারিক হইতে পারিবে।

লোকব্যবহারে, প্রথম সাক্ষাতে পাত্র ও স্থান বিশেষে প্রণাম, নমস্কার, অথবা অন্য কোন শিষ্টাচার-অনুমোদিত সসম্ভ্রম বা সাদর-সম্ভাষণ করা আবশ্যক। সম্মানিত অভ্যাগত ব্যক্তিকে দেখিয়া সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করিতে হইবে। সম্ভাষণাদির পর স্থান ও পাত্র বিবেচনা করিয়া কুশল প্রশ্ন করিতে হয়। এটী সহৃদয়তা ও সৌজন্যের পরিচয় দেয়। সস্মিতমুখে কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে কাহারও কিছু মূল্য লাগে না। কিন্তু এতদ্দ্বারা বিনামূল্যে অনেক সদ্ভাব ক্রয় করা যায়। ইহাতে কৃপণতা করা ভাল নহে। অমায়িকতার অভাব অব্যব-সায়িকের লক্ষণ।

পরস্পরের দেখা সাক্ষাতে সৌহার্দ্দ্য বৃদ্ধি পায়, এইজন্য সভ্য সমাজে দেখাসাক্ষাতের এত আদর। এই সাক্ষাৎকারাদি শিষ্টাচার দ্বারা নিয়মিত হওয়া আবশ্যক। সমাজে সকলেই কর্ম্মশীল। সকলেরই আপন আপন নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম আছে। ছাত্রকে পাঠ অভ্যাস করিতে হয়, বিদ্যালয়ে যাইতে হয়, সময়ে বিশ্রাম, ব্যায়াম ও ভ্রমণাদি করিতে হয়। এবং পরদিনের কার্য্যের জন্য ও স্বাস্থ্যের জন্য যথাসময়ে নিদ্রা যাইতে হয়। ইহার প্রত্যেকটী তাহার কর্ত্তব্য। এইরূপ সকলেরই অবস্থা-নুযায়ী আপন আপন কর্ম্ম আছে। এক্ষণে সামাজিকতা ও শিষ্টাচারের সাক্ষাৎকারও কর্ত্তব্য। এই কর্ত্তব্যটী আত্মগত নহে। পরস্পরের

সুবিধা ও সময় সাপেক্ষ। এইজন্য এই সকল দেখা সাক্ষাতের জন্য, পরস্পরের সময় ও স্থান নির্দ্দিষ্ট করা উচিত। এইরূপ করিলে দেখা সাক্ষাৎ বড়ই প্রীতিকর হয়। অন্যথা অসময়ে দেখা সাক্ষাৎ হইলে নানা প্রকার অসুবিধা হয়। পরস্পরের সুখ, সুবিধা ও তদ্দ্বারা প্রীতিবিবর্দ্ধন করা সভ্য সমাজের রীতি। সামাজিক সকল কার্য্য করিবার সময় এতৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

কি ছাত্র আর কি বিষয়ী সাংসারিক ব্যক্তি, সকলেরই সময়ের মূল্য আছে। মূল্যবান দ্রব্যাদি এবং আর্থিক আদান প্রদান কালে লোকে খুব সাবধান হয়। আর্থিক ব্যবহারে লোকের চরিত্র প্রকাশ পায়। তদ্রূপ নিরূপিত সময়ে কার্য্যাদি দ্বারা লোক চরিত্র প্রকাশ পায়। অতএব নিরূপিত সময়ে বিদ্যালয়ে, কার্য্যস্থানে, সভাসমিতিতে উপস্থিত হওয়া উচিত। দেখা সাক্ষাৎ, নিমন্ত্রণাদিতেও এ বিষয়টীর প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য। সকল কার্য্যেরই সময় আছে এবং সকল কার্য্য নিরূপিত সময়ে করিলে তাহার মূল্য বৃদ্ধি হয়। প্রত্যেক পদার্থটীকে যদি তাহার নির্দ্দিষ্ট স্থানে রাখা যায়, তবে তাহাতে কোনও গোলযোগ হয় না, অধিকন্তু সুশৃঙ্খলা হেতু নানা সুবিধা হয়। কার্য্য সম্বন্ধেও ঠিক সেইরূপ বলিতে পারা যায়। নির্দ্দিষ্ট সময়ে কার্য্য করিলে সর্ব্বত্র সুশৃঙ্খলা হেতু নানা প্রকার সুবিধা হয় এবং কার্য্যও সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়।

এইরূপে দেখাসাক্ষাতাদির সময় সম্বন্ধে সর্ব্বত্র সকলকে শিষ্টাচারী হইতে হইবে। নিজ পরিবার মধ্যে, কুটুম্ব সমাজেও অশন বসন প্রভৃতি সকলই শিষ্টসমাজের রীতি পদ্ধতির অনুমোদিত হওয়া আবশ্যক।

জনসমাজে থাকিতে গেলে, বিভিন্ন প্রকৃতির লোকের সংস্রবে আসিতে হয়। লোকের প্রকৃতি বিভিন্ন হওয়াতে তাহাদের কার্য্য

ভিন্ন ভিন্ন ভাবাপন্ন হয়। সকলের সকল কার্য্য যে প্রীতিকর হইবে এরূপ আশা করা যায় না। কাহার কার্য্য প্রীতিকর হইবে কাহার কার্য্যে বিরক্তি বা ঘৃণা জন্মাইতে পারে, আবার কাহারও কার্য্যে ক্রোধের উদ্রেক হইতে পারে। এক্ষণে যদি প্রত্যেক লোকের প্রত্যেক কার্য্যের দ্বারা বিরক্তি, ঘৃণা বা রোষের উদ্রেক হয়, চিত্তের প্রসন্নতা নষ্ট হয়, তবে তাহা বড়ই পরিতাপের বিষয়। অতএব দেখিতে হইবে কি উপায়ে, এ সকল কারণ সত্ত্বেও চিত্তের প্রসন্নতা রক্ষা করা যাইতে পারে। ইহার জন্য ক্ষমা ও উদারতা আবশ্যক। উদারতা ও ক্ষমা থাকিলে, লোকের অনেক ত্রুটিই উপেক্ষা করিয়া চিত্তের প্রসন্নতা রক্ষা করা যাইতে পারে। উদারতা ও ক্ষমাগুণের বৃদ্ধির সহিত শান্তি ও সখ্য বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। প্রত্যেক শিষ্ট ব্যক্তিরই উদার ও ক্ষমাশীল হওয়া উচিত।

অহঙ্কার শিষ্টাচারের অন্তরায়। আবার আত্মসম্মান শিষ্টাচারের সহায়। জনসমাজে লোকসংস্রবে আসিয়া অন্যের অযথা মনস্তুষ্টির জন্য আপন "ব্যক্তিত্ব" হারান উচিত নহে। মানবের অবস্থা যেমন হউক না কেন তথাপি মানুষ বলিয়া তাহার একটী "ব্যক্তিত্ব" আছে এবং তজ্জন্য আত্মমর্য্যাদাও আছে। এ দুটী মানবের নিজস্ব। এক্ষণে আপনার "ব্যক্তিত্ব" ও আত্মমর্য্যাদায় স্বার্থের জন্য জলাঞ্জলি দিয়া অপরের মতে মত দেওয়া কিংবা অপরের আদিষ্ট নীতিবিগর্হিত কার্য্যে সহায়তা করা অতীব গর্হিত। যাহারা সজ্জন, শিষ্ট ইত্যাকার প্রশংসা বাদের জন্য ঐরূপ কার্য্য করে, তাহারা কদাপি শিষ্ট নহে। লোক-ব্যবহারে অহঙ্কার থাকিবে না কিন্তু আত্মমর্য্যাদা থাকিবে, বিনয় থাকিবে কিন্তু হীনতা থাকিবে না, আপনার ন্যায্য প্রাপ্য ও দেয় বুঝিয়া লইতে হইবে, কিন্তু তাহাতে নীচ স্বার্থান্ধতা থাকিবে না। শিষ্টাচারী ও সজ্জন হইতে হইলে সর্ব্বদা এ সকল বিষয়গুলির উপর

দৃষ্টি রাখিয়া চলিতে হইবে। তাহাতে চরিত্রে ঔজ্জ্বল্য ও মাধুর্য্য প্রকাশ পাইবে কারণ শিষ্টাচার ও সচ্চরিত্রতা বড় বিভিন্ন নহে। জ্যোৎস্না ও রৌদ্রের যে সম্বন্ধ, শিষ্টাচার ও সচ্চরিত্রতার মধ্যে অনেকটা সেইরূপ সম্বন্ধ।

সর্ব্বমত্যন্তম্‌গর্হিতম্

শিষ্টাচারের নিয়মের অন্ধ অনুবর্ত্তনে বিপদ আছে। উহাতে সহৃদয়তা ও সরলতার অভাব আসে। আধুনিক য়ুরোপীয় ও মার্কিণ সমাজ, উহার দৃষ্টান্ত। য়ুরোপ ও আমেরিকায় যেমন প্রায় সকল কার্য্য কলে চলে, তেমনই সেখানকার জীবনটাও যেন কলে চলে। সেখানকার লোকের যে সহৃদয়তা, সরলতা ও অমায়িকতা নাই এমন কথা বলিতেছি না। তবে সেখানকার সৌখিন সমাজে, শিষ্টাচারের নিয়ম পালন অতিমাত্রায় চলিয়াছে। এই অতিমাত্রার একটী গল্প আছে। সেটী এই ঃ—এক দিন একটী ভদ্র যুবক কোন একটী সরোবরের নিকট দিয়া যাইবার সময় একজন মহিলাকে জলে পতিত ও বিপন্ন দেখেন। কিন্তু তিনি মহিলাটীকে তদবস্থ দেখিয়াও কিছু করিতেছেন না, এমন সময় আর একজন ভদ্রলোক তথায় উপস্থিত হইলেন এবং বলিলেন, সে কি মহাশয়! একটী অসহায় স্ত্রীলোক ডুবিয়া যাইতেছে, আর আপনি দেখিয়াও নিশ্চেষ্ট রহিয়াছেন? ইহাতে, যুবকটী ঝটিতি বলিলেন, আমার সহিত মহিলাটির পরিচয় নাই; আমি কেমন করিয়া উহার কাছে যাইব? ভরসা করি গল্পটী গল্প মাত্র। কিন্তু তথাপি শিষ্টাচারের অতিমাত্রার উদাহরণ পাওয়া যাইতেছে। এই জন্য বলিতেছিলাম কিছুরই বাড়াবাড়ি ভাল নয়। সকলে শিষ্ট হউক, শিষ্টাচার সর্ব্বত্র প্রচলিত হউক, কিন্তু সেই সঙ্গে শিষ্টাচারে লোক ব্যবহারে যেন সহৃদয়তা, সরলতা থাকে।

উপসংহার।

ক্রমে ক্রমে শরীর মন ও আত্মার কল্যাণোদ্দেশে অল্প বিস্তর অনেক কথা বলা হইয়াছে। গ্রন্থশেষে, একবার সেই গুলির পুনরালোচনা করিয়া গ্রন্থসমাপন করা যাউক।

ভগবানের বিশেষ কৃপায় মানবজন্ম লাভ করা যায়। মানবজন্ম অতিদুর্লভ। এই পরিদৃশ্যমান জগতে ভগবানের সৃষ্টির মধ্যে মনুষ্য শ্রেষ্ঠ। ভগবান্ মনুষ্যকে কতকগুলি বিশেষ অধিকার দিয়াছেন। এই সকল অধিকার প্রাপ্তির সহিত তাহার দায়িত্বও যথেষ্ট। যাহার যত অধিকার, তাহার দায়িত্বও তত। অধিকার ও দায়িত্ব সমান অনুপাতে হ্রাসবৃদ্ধি পায়। অতএব মানব, ঈশ্বরদত্ত কতকগুলি অনন্যসাধারণ অধিকার লাভ করিয়া নিশ্চিন্ত ও নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিলে অপরাধী হয়; এবং বিধাতার নিয়মবশে, কালে, সে সেই সকল অনন্যসাধারণ অধিকার চ্যুত হয়। কারণ, সৎকর্ম্মে নিশ্চেষ্ট দুষ্ক্রিয়াশীল ব্যক্তি, অচিরে পশুত্ব প্রাপ্ত হয়। দেবদত্ত অধিকার লাভ করিয়া, দৈহিক মানসিক ও আধ্যাত্মিক বৃত্তি সমূহের সম্যক্ অনুশীলন ও সদ্ব্যবহার করিয়া, সুদুর্লভ মানবজন্ম সফল করিতে হইবে। এ জীবন মহাব্রত। ইহার জন্য উদ্যোগ আবশ্যক। উপযুক্ত উদ্যোগ হইলে, অনুরূপ উদ্‌যাপন হইবে। বাল্যে—পঠদ্দশায় জীবনের সেই উদ্যোগ আরম্ভ হয়।

এই উদ্যোগ সর্ব্বাঙ্গীন হওয়া আবশ্যক। এতাবৎকাল, সাধারণতঃ, এই উদ্যোগ যেরূপ ঐকদেশিক বা আংশিক হইয়া আসিতেছে, তাহা বাঞ্ছনীয় নহে। কেবলমাত্র শারীরিক মানসিক বা আধ্যাত্মিক

উৎকর্ষে পূর্ণ মানব হয় না। অথবা এই তিনটীর কোন দুইটীর বিকাশেও বাঞ্ছিত ফল লাভ হয় না। এই হেতু তিনটীর সমকালীন, সামবায়িক ও সমঞ্জসীভূত উৎকর্ষ ও বিকাশ আবশ্যক। ইহাদের উৎকর্ষ ও বিকাশ অগ্রপশ্চাৎ হইবে না। শারীরিক শিক্ষার সহিত মানসিক শিক্ষা লাভ করিতে হইবে। এবং সেই সঙ্গে ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষা দিতে হইবে। ইহাই সামবায়িক শিক্ষা। সেইরূপ, আবার, শারীরিক শিক্ষা এরূপ হইবে যে, তদ্দ্বারা মানসিক শিক্ষার সাহায্য হয়। আর, ধর্ম্ম ও নীতিশিক্ষা এমন হইবে যে, তাহা প্রাগুক্ত শিক্ষার অন্তরায় না হইয়া সহায় হয়। কেবল, কুস্তি, কসরৎ ও যুদ্ধ বিদ্যাদি শারীরিক শিক্ষা দ্বারা শরীরের সম্যক্ উৎকর্ষ সাধন করিলে পূর্ণমানব হয় না। এ উৎকর্ষে মানব, শূর হয়, বা বিকাশপ্রাপ্ত পশু হয়। তেমনই আবার, নিরবচ্ছিন্ন মানসিক বিকাশের দিক দেখিলে চলে না। কেবল পাণ্ডিত্যে কি হইবে? জীর্ণ, শীর্ণ, রুগ্ন দেহে পাণ্ডিত্যে কি ফল? দেহপাত করিয়া উৎকট যোগ সাধন করিয়া, সংসারবিরাগী সন্ন্যাসী হইয়া ধর্ম্ম সাধন করিলেও আদর্শ মানব হওয়া যায় না। মানব সামাজিক জীব; জনসমাজে থাকিয়া, জনহিতকর কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া, দেহ, মন ও আত্মার সম্যক্ বিকাশের চেষ্টা করিতে হইবে। এইরূপ শিক্ষা যে একান্ত প্রার্থনীয়, তাহাই এই পুস্তিকায় বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি। এবং সেই শিক্ষা সাধনের উপায় নির্দ্দেশ করিতে প্রয়াস পাইয়াছি।

পূর্ণমানবত্ব লাভের জন্য উপযুক্ত আয়োজন করিতে হইবে। এতদর্থে পঠদ্দশাই প্রশস্ত সময়। ছাত্রজীবনে, জ্ঞানযোগ সাধন করিতে হইবে। এই যোগের জন্য বলবতী আকাঙ্ক্ষা ও অচলা গুরুভক্তি চাই। নিষ্ঠার সহিত এই জ্ঞানযোগে রত হইতে হইবে। এ সাধনায় যাহাতে সিদ্ধি হয়, তজ্জন্য শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য ও

উন্নতির প্রতি সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিতে হইবে। জ্ঞানযোগী ছাত্র ভগবদ্ভক্ত হইবে। আপন আরব্ধ সাধনায় ইষ্টদেবতার কৃপাভিক্ষা করিবে।

জ্ঞানযোগের পর কর্ম্মযোগ। জ্ঞানার্জ্জনের পর, যৌবনে কর্ম্মক্ষেত্রে উপস্থিত হইবে। কর্ম্মক্ষেত্রে বীর হইতে হইবে। কর্ম্মক্ষেত্রের অপর নাম সংগ্রাম ক্ষেত্র। কারণ এখানে, নানা প্রকার প্রতিকূল শক্তির সহিত সংগ্রাম করিতে হয়। ঈশ্বরের কৃপাভিক্ষা করিয়া নিষ্ঠার সহিত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। কর্ম্মক্ষেত্রে পুরুষকার ও দৈবের সম্মিলন হওয়া আবশ্যক। কর্ম্মে মাত্র মানবের অধিকার। অতএব কর্ম্মফলের জন্য ব্যগ্র বা উৎসুক হওয়া উচিত নহে। "ইহা আমার কর্ত্তব্য"; "অতএব ইহা প্রাণপণে করিতে হইবে"—এই ভাব যেন হৃদয়ে সর্ব্বদা জাগরূক থাকে। যশ, কীর্ত্তি, গৌরব বা লাভের দ্বারা প্রণোদিত হইয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়া ঠিক নহে। কর্ত্তব্যের অনুরোধে, কর্ত্তব্যবোধে কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে হইবে। এইরূপ কর্ম্মশীল ব্যক্তিই ধন্য। এইরূপ কর্ম্মযোগীর সাধনা স্বতঃ সিদ্ধ হয়।

কি জ্ঞানার্জ্জন আর কি কর্ম্মানুষ্ঠান এতদুভয়ই ভক্তির সহিত করিতে হইবে। গৃহে, পিতামাতা ও অন্যান্য নমস্য পরিজন, সমাজে পূজনীয় বয়োজ্যেষ্ঠগণ সাধু ও সুধীগণ, বিদ্যামন্দিরে গুরু, রাজ্যে রাজা ও বিশিষ্ট রাজপুরুষগণের প্রতি সর্ব্বদা সম্মান, শ্রদ্ধা ও ভক্তির ভাব প্রকাশ করা আবশ্যক। সেই সঙ্গে, সকল পবিত্র বিষয়ে, শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতে শিক্ষা করিতে হইবে। এইরূপে, হৃদয়ে ভক্তির ভাব বৃদ্ধি করিতে হইবে। ক্রমে সেই ভক্তি সচ্চিদানন্দের পদাভিমুখী হইবে। শৈশবে, গৃহে, জ্ঞানোন্মেষের সহিত প্রত্যক্ষদেবতা পিতা-মাতার প্রতি যে ভক্তির ক্ষুদ্রধারা হৃদয়ে প্রবাহিত হয়, ক্রমে তাহা গুরু ও অন্যান্য সাধু ও সুধীর দিকে যায়। এবং শেষে তাহা বৰ্দ্ধিত হইয়া ভগবদ্ভক্তি রূপে পরিণত হয়। ইহাই ভক্তির চরম অবস্থা।

বিকশিত বলবীর্য্যসম্পন্ন বরাঙ্গ, জ্ঞান বিভূষিত মন, ভক্তি গদ্‌গদ্‌ হৃদয় ও আত্মা লইয়া মানব আদর্শের অনুরূপ প্রায় হইল ; এত সাধনা ও চেষ্টায় যে অবস্থায় আসা গেল, তথায় কর্ত্তব্য কি ? এ উন্নত ও আদর্শ জীবনের উদ্দেশ্য কি ? কি, তাহা ক্রমে বলিতেছি। আমরা ক্ষেত্র কর্ষণ করি, বীজ বপন করি, তাহাতে যথারীতি জল সেচনাদি করি। ক্রমে উপ্ত বীজ অঙ্কুরিত হয়। যথাকালে সেটী সুন্দর বৃক্ষে পরিণত হয়। এবং কালে, তাহা ফুলফলে সুশোভিত হয়। কিন্তু বৃক্ষের চরমোৎকর্ষের চিহ্ন যে সুপক্ক স্বাদু ফল, তাহার উদ্দেশ্য কি ? যদি সেটী লোকসেবায় লাগে, তবেই সে ফলের সার্থকতা হইল। এইখানেই তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল।

মানবের উন্নত জীবনের উদ্দেশ্যও এইরূপ। ভগবানের ইচ্ছানু-মোদিত যে লোকসেবা, তাহাই জীবনের উদ্দেশ্য। লোকসেবায় বিশ্বজনীন প্রেমের আবশ্যক।

মানব-মন সীমাবদ্ধ। মানবের জ্ঞান সান্ত কিন্তু মানবহৃদয় অনন্ত প্রসারিত—মানবপ্রেম অনন্ত। মানবের প্রেমে, ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র কীটাণু হইতে বৃহৎ হইতে বৃহত্তম প্রাণী স্থান পায়। মানব জগতের হিতের জন্য, চেতন, অচেতন, উদ্ভিদ সকলই প্রেম প্রণোদিত হইয়া রক্ষা করে। কিন্তু মানব, বুদ্ধি বিচার দ্বারা কাহাকেও নীচ বোধে, ঘৃণ্যজ্ঞানে ত্যাগ করে, কাহাকেও উচ্চ ও বরণীয় বলিয়া সাদরে আহ্বান করে। মানব-মন, ভেদজ্ঞানে পূর্ণ। মানবপ্রেমে সকলেই সমান। সেথায় সকলেই স্থান পায়। যে জগাই মাধাইকে রাজা ও সমাজ দুর্ব্বৃত্তজ্ঞানে ত্যাগ করিয়াছিলেন, প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্যের প্রেমে তাঁহারা স্থান পাইয়া সাধু হয়েন। জ্ঞানগরিমাপূর্ণ আয়ুর্ব্বেত্তা চিকিৎসক সম্প্রদায় যে দুরারোগ্য পীড়াগ্রস্তগণকে অস্পৃশ্যজ্ঞানে লোক-সমাজে স্থান দেন নাই, ফাদার দামিয়েন্‌র হৃদয়ে তাহারা স্থান পাইয়া-

ছিল। জ্ঞানে ও প্রেমে অনেক পার্থক্য। জ্ঞান ও প্রেমের ব্যাপকতা সমান নহে। জ্ঞান আলোক, প্রেম বায়ু। আলোক যেখানে যায় না, বায়ু সেখানে বহে। জ্ঞানী ও সুধীগণ প্রেমিক সাধুদিগের নিকট অবনতমস্তক। এ বিশ্বের আদি, অন্ত ও মধ্য, সর্ব্বত্রই প্রেম। এ বিশ্ব—প্রেমের রাজ্য। এবং এই বিশ্বপ্রেমই ভগবানের উৎকৃষ্ট আরাধনা। ভক্তশ্রেষ্ঠ প্রহ্লাদ উপদেশ দিয়াছেন।

"সর্ব্বত্র দৈত্যাঃ সমতামুপেত।
সমত্বমারাধনমচ্যুতস্য ॥"

অর্থাৎ সর্ব্বজীবে সমতাযুক্ত হইতে হইবে কারণ এই সমত্বই অচ্যুতের আরাধনা।

দেহ মন ও আত্মার সম্যক্ বিকাশ হউক, সেই বিকশিত জীবন ভগবানের সহিত ভক্তিযোগে যুক্ত হউক। ভগবানের অনন্ত প্রেমের আভা সেই জীবনে পতিত হইয়া রঞ্জিত হউক। মানব তখন প্রেমিক হইয়া ভগবান ও তাঁহার সমগ্র সৃষ্টির সেবায় আত্মজীবন উৎসর্গ করিবে। এই সেবাধর্ম্মের অনুশীলন করিয়া, মানব জীবনের শান্তি পর্ব্বে উপনীত হইবে।

সম্পূর্ণ।